গ্যাস্ বেলুন

বিমল দত্ত

প্রাপ্তিস্থান :

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা – ৯

প্রকাশক :
শ্রীপরিমল বিশ্বাস
২৩।২, বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-২

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৮

মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর
শ্রীগঙ্গারাম পাল
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

উপহার

গল্পক্রম

—o—

গ্যাস্ বেলুন

রীতিমত নাটক

(পুরুষ ভূমিকা বর্জ্জিত)

গ্রীষ্মের ছুটীর আগে যে মেয়েটী আমাদের বোর্ডিংয়ে ভর্ত্তি হ'ল তাকে নিয়ে আমরা বড় একটা মাথা ঘামাইনি। কেমন যেন খুকী-খুকী ভাব। মেয়েটি একটু দলছাড়া গোছের, আর কেবল খাতায় আঁক কষছে! অদ্ভুত! অদ্ভুত। আমাদের কারুর সঙ্গেই সে বন্ধুত্ব পাতাতে চেষ্টা করলে না। আমরা যখন দয়া করেই ওক আমাদের লুকিয়ে খাওয়া দলের সভায় নেমন্তন্ন করলুম—সে আস্‌তে চাইলে না—বিছানায় কুঁকড়ি শুঁক্‌ড়ি মেরে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু গরমের ছুটীর বন্ধের দিন-দুই আগে ও যখন একটা প্যাক-বাক্সে করে কি নিয়ে ওর খাটের তলায় ঠেলে ঠুলে রেখে দিলে তখন ওর কিরকম একটা চন্‌মনে ভাব লক্ষ্য করলুম —ওর মধ্যে যেন কোন রহস্য আছে।

আমাদের কৌতূহল জাগ্‌ল। ছন্দা এসে চুপ্‌চুপ্‌ নন্দিনীকে বল্‌লে, "রেখা একটা বাক্স করে ভাই কি এনেছে।"

নন্দিনী বল্লে, "ছাই এনেছে—ও আবার আমাদের খাওয়াবে?"

আমি বল্লুম, "আহা আমাদের খাওয়াবে কেন? তোর যেমন কথা বলার ঢং। ও নিজেই খাবে—লুকিয়ে লুকিয়ে টপ্পা

দেবে—কী হ্যাংলা হুতুম্‌থুমো মেয়ে বাবা—সাত জন্মেও ওরকম দেখিনি।”

ছায়া এই সময়ে এসে পড়্‌ল। সব শুনে বল্লে, “মেয়েটা বড্ড দেমাকে—দেখিস্‌ না এতদিন এসেছে কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেন কথাই বল্‌তে চায় না—ভারী চাল্লুজ্‌ কিন্তু।”

বিকালে কম্পাউণ্ডে ব্যাড্‌মিণ্টন্‌ খেলার সময়ে আমরা যখন তার ঘরে গেলুম ও যেন কেমন নীল্‌-মেরে গেল। সেই চন্‌মনে ভাব—আচার চুরি করতে গিয়ে যেন পিসীমার সামনে পড়ে গেছে!

বন্দনা জিজ্ঞাসা করলে, “ঐ বাক্সটাতে কি আছে ভাই রেখা?”

রেখা কেড্‌স্‌ শুটার ফিতে আঁট্‌তে আঁট্‌তে বললে, “কি আবার থাকবে? “কিন্তু হাবভাবে যেন আমাদের জানালে, যাই থাকুক না তোমাদের অত ভাবনা কেন? সবতাতেই অত কৌতূহল ভাল না।”

ঠোঁট্‌ দুটো কুঁচকে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী করে মঞ্জুশ্রী বল্‌লে, “ও। ঘরের আসবাব বাড়াচ্ছ বুঝি? তা বেশ! তা বেশ! ওটা বুঝি জাপানী মেহগনীর সিন্ধুক!”

কমলা বল্লে, “তুই ত' ভারী কাঠ চিনিস্‌! ওটা আফ্রিকার কঙ্গো রাজ্যের জঙ্গলের ভারী দামী কাঠ—নামটা যেন মনে আসছে না—“বলে হেসে উঠ্‌লো।

অমিতা বল্লে, “চাল্লুজ কাঠ।” সঙ্গে সঙ্গে সকলের সেকি ঘর কাঁপানো হাসি!

এই নিয়ে রেখার সঙ্গে আমরা আর কোন কথা কইনি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা পূরো দমেই চালাচ্ছিলাম।

বোর্ডিংয়ে ক্রমশঃ খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, রেখা এক বাক্স খাবার এনে তার খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছে—রোজ একা একা খায়—লুকিয়ে লুকিয়ে খায়।

সকলেই এতে ক্ষেপে গেল। আমাদের বোর্ডিংয়ের অলিখিত আইনে এরকম করা রীতিমত আইন ভঙ্গ। কেউ কিছু খাবার আন্‌লে সকলে ভাগ করে খাবে—তা সে ঝালছোলাই হোক্ আর আইস্‌ক্রীমই হোক্। নিজে নিজে গেলার মধ্যে আবার মজা কি! ঐ পুঁচকে পুতুল মতন মেয়েটা আমাদের মেয়ে-বোর্ডিংয়ের এত কালের আইন ভেঙে দেবে?

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর রত্নমালার ঘরে মিটিং বস্‌ল। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর আমরা ঠিক করলুম যে কিছু একটা করা দরকার।

মঞ্জুশ্রী বল্লে, "ওকে একটা শিক্ষা দিতে হ'বেই হ'বে।"

আমি বল্লুম, "কিন্তু কি করে?"

মুট্‌কু অমিয়া বল্লে, "ধরে বেশকরে সকলে মিলে কাইকুতু লাগাও।" অমিয়ার ঐ দোষ। জীবনে কোনদিন ও যদি একটা কাজের পরামর্শ আমাদের দিতে পেরেছে!

ফুল্লরা বললে, "চুপ কর তুই—আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।"

জয়শ্রী ফুল্লরার চুল ধরে টেনে মাথাটা বার দুই ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে, "নেরে নে—নয়ত তোর মতলব থিতিয়ে যাবে যে!"

গম্ভীরভাবে কমলা বল্লে, "আঃ বড্ড গোল করছ সব—এখ্‌খুনি চিম্‌ড়ে সুপারের ঘুম ভেঙে যাবে—বকের মত গলা বাড়িয়ে এসে চিঁচিঁ করে ধমকাবে—"এঁতঁ গোঁল কঁরছঁ কেঁনঁ রাঁত দুঁপুঁরে?" সুপারের গলার অবিকল নকল। মেয়েরা হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়্‌ল।

নন্দিনী বল্লে, "এই রাক্ষুসী ফুলুরি, তোর মাথায় কি মতলব এসেছে বল্‌না—"

ফুল্লরা গম্ভীর হ'য়ে গাল দুটো ফুলুরির মত করে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "ওকে একবার শেষ চান্স দেওয়া হোক্—ও যদি না দেখায় ওর বাক্সে কি আছে, আমরা ওর ওপর চড়াও হ'য়ে ওর মুখে কাপড় গুঁজে ওকে বেঁধে রেখে বাক্স লুট করব।"

ছায়া, বন্দনা ও আরো অনেকে ফুল্লরার কথা শুনে তাকে জয়ধ্বনি করে অভিনন্দন জানালে।

মঞ্জুশ্রী বল্লে, "ফুলুরি, তুই ভাই বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়।"

সকলেই এই যুক্তিতে সায় দিলে।

রাত আর একটু গভীর হ'লে বন্দনা সুপারের ঘরের কাছে গিয়ে বাইরে থেকে শুনে এল যে তিনি নিশ্চিন্তে ঘড়্ ঘড়্ করে নাক ডাকাচ্ছেন।

তারপর আমাদের ক্ষুদ্র মেয়ে-গুণ্ডাদের দল তৈরী হল। মঞ্জুশ্রী তার স্কিপিং দড়িটা হাতে নিলে, জয়শ্রী নিলে একটা টৌয়ালে, আমি নিলুম হাতুড়ি, বন্দনা নিলে পাঁউরুটি কাটা ছুরি।

ছায়া প্রথমে গিয়ে রেখার দরজায় ঘা দিলে "রেখা, দোর খোলো"—

রেখার বোধ হয় সবে ঘুম এসেছিল। সে ধড়্মড়্ করে বিছানায় উঠে বস্‌ল, জিজ্ঞাসা করলে "কে ?" সেই ভীতু খুকীর মত গলা।

ছায়া বললে, "আমি ছায়া, একটু দরকার আছে—দোর খোল।"

রেখা দোর খুলে দিলে। করিডোরের লাইটের আলো বাঁকা হ'য়ে তার ঘরের মেঝেতে গিয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, ঘর

তখন অন্ধকার—কারণ রাত দশটা বাজ্‌লেই সব ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়।

ছায়া ঘরে ঢুকে বল্লে, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বোসো।"

আমরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে কাণ খাড়া করে রইলুম। মনের ভাবটা ঠিক গুণ্ডাদের মতই—তবে উত্তেজনায় বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছিল সবাইয়েরই।

রেখা বল্‌লে, কি কথা? এই রাত দুপুরে?

ছায়া বল্‌লে, "আমি বোর্ডিংয়ের সমস্ত মেয়ের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, তুমি তোমার ঐ কাঠের বাক্সে কি আছে তা আমাদের দেখাবে কি না?"

রেখা ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "তাতে তোমাদের দরকার কি?"

ছায়া আবার বল্লে, "এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, বলো, ঐ বাক্সে কি লুকিয়ে রেখেছ?"

রেখা দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলে, "না বোল্‌ব না।"

"রেখা, সত্যি করে বলোত, ওতে খাবার লুকোনো আছে কি না—আমসত্ত্ব, জেলি, সন্দেশ, সরভাজা এই সব আছে কি না? বলো—"

"না, ওসব কিছু নেই।" তার গলার স্বর যেন কেঁপে উঠলো।

"তবে অন্য কোন খাবার নিশ্চয়ই আছে?"

"না কোন খাবার নেই ওতে।"

"তবে কি আছে?"

"তা আমি বল্‌ব না। আমার বাক্স—যাই থাকুক না কেন, তোমার দরকার কি?"

“খাবারই আছে তাহ’লে। আচ্ছা যদি তা না হয় দেখাও না কেন বাক্স খুলে !”

“কেন দেখাবো ? জোর নাকি তোমাদের !”

ছায়া ছোট্ট বাঁশীতে ফুঁ দিলে পিঁ—পিঁ—

অম্‌নি আমরা সব মেয়েগুণ্ডার দল করিডোর থেকে নিঃশব্দে ছায়ার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। তিনি চারটে টর্চ্চের আলো ঘরের মধ্যে জ্বলে উঠে রেখাকে ঘিরে ধরলে।

জয়শ্রী রেখার মুখে তোয়ালে দিয়ে বেঁধে ফেল্‌লে। মঞ্জুশ্রী স্কিপিং দড়ি দিয়ে জড়িয়ে তাকে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে দিলে। তারপর খাটের তলা থেকে কাঠের প্যাক্‌-বাক্সটা বন্দনা টেনে আন্‌লে—আমি হাতুড়ির মুখ দিয়ে পেরেকগুলো পট্‌পট্‌ তুলে ফেল্‌লাম, বন্দনা পাঁউরুটী কাটা ছুরি দিয়ে বাক্সের কাঠগুলো তুলে ফেললে······একেবারে রীতিমত ডাকাতি !

ভিতর থেকে শব্দ হ’ল, কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ চিঁ চিঁ—কিঁচ্‌ কিঁচ্‌···“ও কিরে—” সাত হাত পিছিয়ে এলাম।

বন্দনা সান্ত্বনার হাত থেকে টর্চ্চটা নিয়ে বাক্সের মধ্যকার অন্ধকারে আলো ফেল্‌লে এবং সঙ্গে সঙ্গে “মাগো” বলে এক লাফ মেরে উঠ্‌ল রেখার টেবিলের উপর।

দু’তিন জন জিজ্ঞসা করলে, “কিরে কি ? কি আছে রে ?”

মুট্‌কু অমিয়া দেখতে গিয়ে আঁৎকে উঠ্‌লো, “উ-উ-উরি—ইঁদুর—ইঁদুর” বলে সব মেয়েদের ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে বস্‌ল।

সত্যিকথা বল্‌তে কি—আমরা মেয়ে-গুণ্ডারা কাউকেই ডরাই না, চোর-ডাকাত, বদমায়েস্‌, বুনোজন্তু—কাউকে না—কিন্তু ঐ আরশুলা আর ইঁদুর, মাকড়সা—দেখলেই প্রাণ ধড়ফড় করে ওঠে।

ছায়া ত, টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বন্দনাকে জড়িয়ে ধরে থর্ থর্ করে কাঁপছে। কমলা কেবল বলছে "বন্ধ করে দে— বাক্সটা বন্ধ করে দে—"
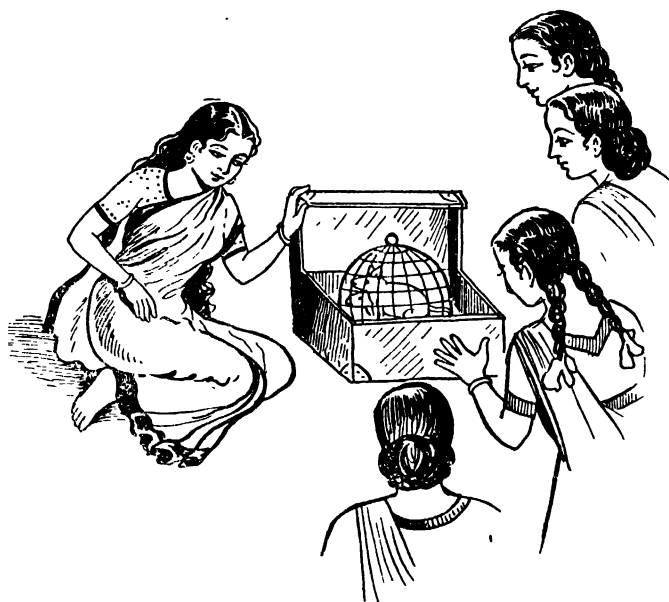
কিন্তু যায় কে? সকলেই রেখার খাটের উপর দাঁড়িয়ে —কেউ বা জান্‌লায়, কেউ বা টেবিলে উঠেছে।......

ওদিকে রেখা পরিত্রাহি হাসছে, "হিঃ হিঃ খ্যা খ্যা খি খি খি খি···তারো কি হিষ্টিরিয়া হ'ল নাকি!"

আমি গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিলুম। বল্লুম, "তোমার আগেই এ কথা বলা উচিৎ ছিল।"

রেখা বল্‌লে, "কেন বল্‌ব? তোমাদের দরকার কি?" বল্‌তে বল্‌তে প্যাক-বাক্সের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে।

আমরা ত' তার সাহস দেখে স্তম্ভিত···করে কি এ!

সে বাক্সের মধ্য থেকে একটা তারের খাঁচা বার করে

মেঝেরউপরর রাখলে। খাঁচা ভর্ত্তি শাদা ইঁদুর···ভয়ে তারা ছুটোছুটি করছে।

রেখা ছুঁচোর মত মুখ ছুঁচ করে তাদের আদর করতে লাগ ল "চুঃ চুঃ চুঃ"

তবু ভাল খাঁচার মধ্যে আছে। মেয়েরা ভরসা পেয়ে সব একজায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়ালো।

আমি বল্লাম, "বোর্ডিংয়ে ইঁদুর এনেছ যে বড়ো? নিয়ম জান না বুঝি?"

রেখা বল্লে, "জানি, আর সেই জন্যেই তোমাদের বলিনি··· কারণ তাহ'লে কথাটা সুপারের কাণে যেত। আমার ছোটভাই পটলের জন্যে ওগুলো কাল কিনেছি···দোকানদার রাখ্‌তে চাইলে না—তাই লুকিয়ে ঐ বাক্সে করে রেখেছিলাম। তারপর কাল স্কুলের ছুটীর পর নিয়ে যেতাম। তা তোমাদের যা খাবার লোভ···ইঁদুর পর্য্যন্ত ছাড়বে না।" নাও এখন ভাজা করে খাওগে। বলে রেখার সে কি হাসি।

আমরা সক্কলে এত বোকা বনে গেলাম যে আর কথাটি কইতে পারলুম না। ওঃ! খুকী খুকী ঐ মেয়েটা আচ্ছা জব্দ করেছে যা'হোক্।······

সেই থেকে আর কারু বাক্স নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। সত্যি মেয়েদের এই অযথা কৌতূহল খারাপ। নয় কি? কি বলো তোমরা?

[* ইংরাজী গল্প অবলম্বনে লিখিত]

দুনিয়ার ছোট ছোট ছেলেগুলোর যে কি দরকার তা' বুঝি না ! আমাদের বাড়ীতে মায়ের একটা ছোট ছেলে আছে—মা ত' তাকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না। অথচ আমি ত' বাপু সে ছেলেটার মধ্যে তেমন কিছু দেখ্‌তে পাই না। কাজের মধ্যে সেটা কেবল কেঁদে বাড়ী মাথায় করে তুল্‌তে পারে—হাতের কাছে চুল পেলে মুঠো করে ধরে টানে আর লাথি ছোঁড়ে। আমার কুকুরটার যা বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ওর তাও নেই। মা রাতদিন বলেন "না বাপু, কুকুরটা তাড়া,—ওর জ্বালায় জ্বলে মলুম"—অথচ ছোট ছেলেটার বেলায় দণ্ডে পঁচিশবার তাকে আদর কর্‌ছেন আর বলছেন "মিষ্টু, সোনু, গোপ্‌লু—"এসবের মানে বোঝা ভার !

সবচেয়ে আমার বিচ্ছিরি লাগে, যখন আমার উপর ঐ বিচ্ছু ছেলেটার দেখাশুনা করবার ভার পড়ে। আবার দেখাশুনা করলেও দোষ ! আমায় হয় ত' বল্‌বেন "ভুলুবাবু, ছেলেটাকে একটু ধরত'—লক্ষ্মী সোনা ছেলে।"

তারপর ছেলেটাকে নাও, খানিক পরে শুন্‌বে—"না না অমন কোরো না—কোলে নিয়ে থাক—নাঃ ভুলুটা ঐ খোকাকে শেষ কর্‌বে। এই বদ্‌মাস্‌, সোজা করে কোলে নে না।"

কলিকাল কিনা ! কাজ আদায় করবে আবার বক্‌বে !

এই ত' গেল-শনিবার মা আর কাকিমা গেলেন পাশের

বাড়ীতে কার অসুখ দেখ্‌তে। আমাকে বলে' গেলেন খোকাকে দেখ্‌তে। অথচ রায়বাবুদের মাঠে সেদিন একটা খেলা ছিল—তা' আমি খেলা দেখ্‌তে পাই আর না পাই তাতে কার কি আসে যায়! যাবার সময় আমার উপর হুকুম হ'ল "আমরা এখনি ফির্‌ব—যদি খোকা জাগে ত' ওর সঙ্গে খেলা কর্‌বে, আর দেখ্‌বে যেন কিছু মুখে পুরে না দেয়।"

তথাস্তু।

মা আর কাকীমা চলে যেতে আমি দেখ্‌লাম খোকা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কাজেই আচার বা অন্য কিছু খাবার-দাবারের আশায় ভাঁড়ার ঘরের দিকে গেলুম।

ওমা, সব যে তালা বন্ধ! উঃ কি অবিশ্বাস দেখেছ! আমি যদি মেয়ে মানুষ হতাম, তা' হ'লে কখ্‌খনো ভাঁড়ার ঘর অমন করে' বন্ধ করে নীচ মনের পরিচয় দিতাম না।

যা হোক্, ভাঁড়ার ঘর ঘুরে এসে দেখি খোকাবাবু জেগে চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন! বাপ্‌রে, সে কি চীৎকার! থামাতে ত' হ'বে তাকে—কি করি, হাতের কাছে যা পেলুম তাই তার হাতে তুলে দিলুম। জিনিষটা আর কিছু না, বাবার জুতোয় মাথাবার কালির বোতল—তার মুখটার ছিপি বন্ধ ছিল, আর ছিপি থেকে একটা তারের ব্রুশ ভিতরে ঢোকানো ছিল। যেই না সেইটা হাতে পাওয়া, খোকা অমনি চুপ।

মনে মনে বেশ আনন্দ হ'ল। মাও বোধ হয় খোকাকে এত শীঘ্র চুপ করাতে পারতেন না! খোকা চুপ করেছে। কাজেই আমি একখানা কাগজ নিয়ে পড়্‌তে বস্‌লুম। খানিক বাদে চোখ তুলে দেখি—সর্ব্বনাশ—ছিপি খুলে খোকাটা প্রায় তার অর্দ্ধেক-মুখে কালি মেখে ফেলেছে, আর সেই তারে-লাগানো বুরুশটা মনের আনন্দে চুষ্‌ছে। মা এসে এজন্যে আমাকেই

ধমকাবেন, জানা কথা, আর বল্‌বেন, "হায় হায়, আমার অত আদরের খোকাটা একদম ময়লা, নোংরা বিচ্ছিরি হ'য়ে গেছে !" কি করা যায় ?

ভেবে দেখ্‌লুম ছোট ছেলেদের পক্ষে একদম কালো হওয়া মন্দ না—বিশেষতঃ আমাদের খোকাটা যখন অর্দ্ধেক কালো হ'য়ে বসে আছে। তার উপর একটা নতুন কিছু ত'—মা হয় ত' আমার উপর খুসীই হ'বেন। কাজেই হাত চালিয়ে খোকাকে
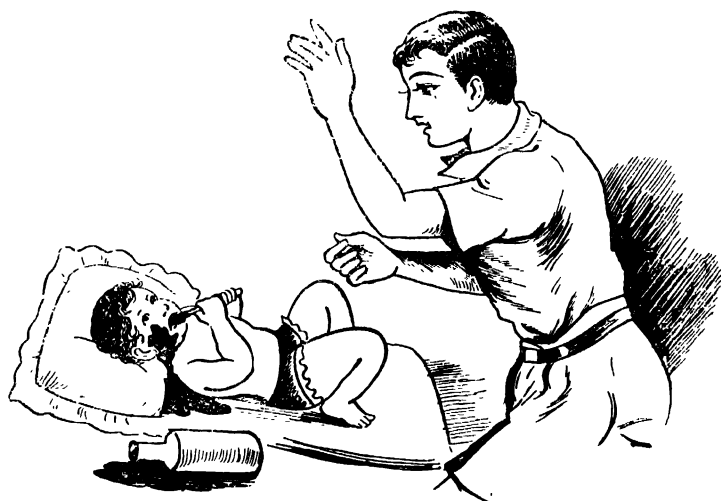
শীঘ্র ঝুলকালো রঙ্‌ করে ফেল্‌লাম। মুখটা—বিশেষতঃ চোখের কাছটা যেন কি-রকম কি-রকম দেখাতে লাগ্‌ল—তা ছাড়া গা-টা যা সুন্দর দেখাচ্ছিল ! কি বল্‌ব—ঝক্‌ ঝক্‌ কর্‌ছিল !

ঠিক সেই সময়ে মা আর কাকীমা এসে হাজির। তারপর যা হ'ল ! বকুনি খেতে হ'ল—বিস্তর গালাগালির ঝড় বইতে লাগ্‌ল—"খুনে, ডাকাত, বদ্‌মাস্‌ ছেলে—কোন্‌ দিন ফাঁসিতে ঝুল্‌বে—কোন্‌ দিন জেলে যাবে যে হতভাগা, এতটুকু বুদ্ধি নেই তোমার" ইত্যাদি—

যাক্, ওসব আমি গায়ে মাখি না! ভাল কর্‌তে গেলে আমার সবই মন্দ হয়। খোকাটাকে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছিল, যদিও রঙটা তেমন পাকা নয় বলেই যা আমার দুঃখ—ডাক্তার নাকি বলছেন, যে সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যে রঙ উঠে যাবে।

তাও কি আমার দোষ? তোমাদের জুতোর কালির রঙ্ যদি পাকা না হয় ত' আমি কি কর্‌ব? একটু কৃতজ্ঞতাও কারুর নেই। আচ্ছা, আপনারাই বলুন—একটা ছট্‌ফটে বিচ্ছু ছেলেকে কালি দিয়ে রঙ্ করায়—(অতি সাবধানে—যাতে চোখে বা চুলে রঙ না লাগে—) বাহাদুরি নেই? সেইজন্যেই ত' মাঝে মাঝে ভাবি, নাঃ এই কঠিন অকৃতজ্ঞ জগতে বেঁচে ফল নেই!

খাঁচার দরজা খোলা পেলেই ময়নাটা যে ফুড়ুক্ ক'রে উড়ে পালাবে তা আমি কি ক'রে জান্‌বো বাপু! হতচ্ছাড়াকে এত দুধকলা আর ছাতু খাওয়ালুম্ কি উড়ে পালাবার জন্যে? আর ছোট কাকা এইজন্যে আমার মাথায় অমন পাথুরে গাঁট্টা কষালেন আর ধম্‌কালেন "এতটুকু বুদ্ধি নেই ঘটে? কেবল লালুকে পেণ্ট কর্‌তে শিখেছ?"

হুঁঃ বুদ্ধি ত' আমার নেই-ই। থাক্‌লে কোন্ কালে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতুম ঐ ময়নাটার মতই ফুড়ুক্ করে। দরজা খোলা পেলেই পাখীটা পালাবে?

কৈ দরজা খোলা পেলে আমি ত' পালাই না। আমাকেও

ত' ওরা সব ওই পাখীটার মতই পুষছে। দু'বেলা খেতে দেয় আর পাখীটার মতই পড়ায়—বাস্!

যেদিন পালাবো উড়ে' বুঝ্‌বে সেদিন—ছোট কাকাবাবুকে আবার রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়াতে হ'বে—থানায় থানায় ফোন্ কর্‌তে হবে। ক্রিং ক্রিং হ্যালো—বাঃ কী—মজা!

মেনীটাকে কিন্তু ছেড়ে যেতে মায়া কর্‌ছে—আর আর—ওই সাদা ইঁদুরগুলো—তা না হ'লে ফুঃ ক'রে চ'লে যেতাম জাহাজ চ'ড়ে সেই যে কোথায় ন' মামাবাবু সেবার গেলেন—বর্ম্মা—হ্যাঁ, বর্ম্মায়।

কিম্বা রেল্ চড়ে কু ঝিক্‌ঝিক্ ক'রে একদম্ দিল্লী-লাহোর মক্কা-মদীনা যেখানে খুসী।

কিন্তু ভয় ক'রে বড় ঐ লম্বাচওড়া পাগ্‌ড়ীপরা কাবলীদের আর চীনেম্যানদের। শুনেছি কাব্‌লীরা নাকি ছেলে ধ'রে ঝুলির ভিতর পু'রে দেশে নিয়ে যায়। আর সেখানে কিস্‌মিস্, পেস্তা খাওয়ায়—বাঁটুল ত' তাই বল্‌ছিল—কিন্তু শুধুই কি কষ্ট ক'রে ছেলে ধ'রে নিয়ে যায় আর মেওয়া খাওয়ায়—নাঃ কোন বদ্ মতলব আছে। পোষবার ফন্দিটন্দি নিশ্চয়ই আছে। রোজ দেখি পিঠে মস্ত মস্ত ছেলের মোট নিয়ে চলেছে। আর সেদিন গড়ের মাঠে দেখি একটা ছেলেকে একটা চীনেম্যান্ পুষেছে। তাকে চীনেম্যান্ সাজিয়ে হাত ধ'রে বেড়াচ্ছে।

ছোট কাকা বল্‌লেন—"দেখ্ ভুলু, কাদের ছেলে ধ'রে নিয়ে পোষ মানিয়েছে।"

আমার একটুও বিশ্বাস হয় নি—কিন্তু বড্ড ভয় কর্‌ছিল। কাকাবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বল্‌লুম—"ও ত' চীনেম্যান্‌দের ছেলে—থ্যাব্‌ড়া নাক—"

কাকাবাবু বললেন—"ধ্যেৎ! ছেলেদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে

ওরা সিরিষ কাগজ ঘ'সে নাক খ্যাঁদা ক'রে দেয় আর রোজ আর্শুলার চাট্নী, আর ডিমের মাম্লেট্ খাওয়ায়—" ওয়াক্ থুঃ—

তাই বল্ছিলেম, কবে ময়নাটার মত পালাতুম্ কিন্তু ওই কাব্লী আর চীনে যে কল্কাতার রাস্তায় রাস্তায়।

আমি অন্যায় কাজ করলেই—ধম্কানি আর বকুনি, গাঁট্টা আর চাঁটি—কিন্তু উপকার কি ওদের আমি করি নি? ছোট কাকাকে সেবার ত' বাবা আর একটু হ'লেই মার্তেন—ছোট কাকা কলেজ কামাই ক'রে চন্দননগর বেড়াতে গিয়েছিল। আমার সাম্নেই ত' বাবার জোর্ জেরা চল্লো—ছোট কাকা ত' সেদিন মিথ্যে কথার থলি উজোর ক'রে দিলে। আর আমার দিকে চেয়ে চেয়ে আমাকে চোখ টিপে মার্তে লাগল—"বলিস্ নি ভুলু—।"

আমি ত' কিছু বলি নি বাপু—তা ছাড়া যদি ব'লে দিতুম—"রোজ দুপুরে বৈঠকখানায় তাস খেলা হয়?"

ছ্যাঃ—সেই ছোট কাকা আমায় গাঁট্টা মারলে—বাড়ী থেকে পালাতে আমাকে হ'বেই,—তবে একটু বড় হ'য়ে নিই।

বড় হওয়ার অনেক সুবিধা। যা' খুসী তাই করো—রাতদিন গল্পের বই পড়ো—যত খুসী জল মাখো—যত বড় হোক্ টেরি কাটো—যত গণ্ডা হোক্ পান খাও—যেখানে খুসী এক্লা বেড়াও—বায়স্কোপ দেখো—যা খুসী তাই করো। ছোটদের গাঁট্টা মারো—কেউ কিছু বলবার নেই।

এই যে ছোট কাকা আমায় গাঁট্টায়, মা কিছু বলে না। আর আমি সেদিন লালুকে যেই না চিম্টি কেটেছি, অমনি মা, দিদি, ছোট কাকা সকলে মিলে আমাকে মারলে। ছোটদের যদি গাঁট্টা না মারবো বা চিমটি না কাটবো

তবে বড় হ'য়েছি কেন? তোমরা কৈ বাপু সে কথা ভাবোনা ত'!

মা বললেন, "হতভাগা ছেলে ছোট বাচ্চাকে মারা!"

আচ্ছা একটু ধাড়ি হোক্ তখন দেখা যাবে!

তখন আর দেখ্‌ব কি? ও আমার দেখা আছে। মার খাবাব জন্যে আছে কেবল ভুলু—ধম্‌কানি খাবার জন্যে ভুলু—আদরের বেলায় লালু! ঐজন্যেই ত' যখন কেউ কোথাও থাকে না—ওকে চিমটি কাটি আর চাঁটি মারি। কিন্তু কেউ না দেখ্‌লেও ওরা ঠিক্ বুঝ্‌তে পারে যে আমার কাজ। তাই মাঝে মাঝে ভাবি—"দুত্তোর ছাই—বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই অনেক অনেক দূরে।"

গল্পের মত গল্প

ভোরবেলা জানলা গলিয়ে খবরের কাগজটা ফেলে দেওয়া-মাত্র চাকর সেটা বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। বাড়ীশুদ্ধ সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার উপর।

—"দেখি-দেখি"—

…"আরে খেলার খবরটা পড়োত' !"

…"শেয়ার বাজারের পাতাটা দেখি একবার চোখ বুলিয়ে—"

…"দিল্লীর খবর তো বেশ জবর হে !"

…"পাকিস্তানের অবস্থা যে দিন দিন জটিল আকার ধারণ করছে হে"…

…"সম্পাদকীয়টা আজকাল জলো জলো লিখ্‌ছে !"

সারা সকলটাই বাড়ীর কেউ না কেউ কাগজটা নিয়ে পড়লো।

দুপুরে কাগজটা এল মেয়ে-মহলে। বায়োস্কোপের খবর, থিয়েটারের খবর, বিজ্ঞাপন, হারানো প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ…কিছু বাদ গেল না পড়তে।

খবরের কাগজটা ভাবলে…ওঃ আমি কি হনুরে…আমার কি কদর !

বিকালের দিকে কেউ কিন্তু আগ্রহ করে কাগজটা হাতে তুলে নিল না। দুমড়ে, ভাঁজ খেয়ে সেটা একধারে পড়ে রইল।

পরের দিন খবরের কাগজটা অবাক হয়ে দেখলে—কেউ আর তার দিকে তাকাচ্ছে না। কেউ যদি বা অন্যমনস্ক হয়ে হাতে তুলে নেয় ত' পরক্ষণেই চোখ বুলিয়ে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়···"দূ্যৎ! এ যে কালকের কাগজ!"
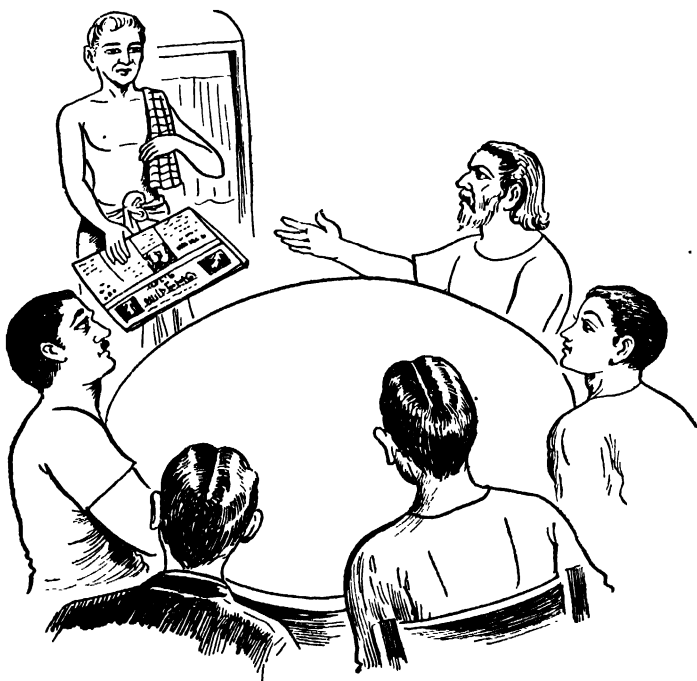
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খবরের কাগজটা বললে···"হায়! ওদের কত অল্পেই বিরক্তি ধরে যায়! এরি মধ্যেই আমাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দিলে গো।"

খবরের কাগজ-রাখা কাঠের র‍্যাক্‌টা এতক্ষণ তার রকম-সকম দেখছিল। সে বল্লে, ঠোঁট ফুলিয়ে আর হচ্ছে কি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে কিছুটি লাভ নেই। সকলেই এগিয়ে চলেছে, সামনের দিকে সকলের দৃষ্টি; গতকালের কাগজ কোন

য়ে গবেষণা করবার কারুরই উৎসাহ নেই ভাই! তোমাকে
খন উনুন ধরানোর কাজে লাগাবে···

তোমার মত
দেখনু কত···
ছট্ ফটিয়ে
মট্ মটিয়ে
শেষকালেতে
হইল নত
কত কত
শত শত!
হইল গাদা
হল্‌দে শাদা
ধূলোয় ধূলো
শেষটা চুলো!

খবরের কাগজটা শিউরে উঠে বল্লে, "হায়! হায়। এই আমার জীবনের পরিণাম। আমার নতুন প্রাণ, নতুন

র‍্যাক্‌টা বল্লে, "আর উপায় কি ভাই, ব্রজেন বাঁড়ুজ্জে টাই ছিল। তিনিই কেবল পুরোনো কাগজের কদর তেন। একে বাংলা দেশ তায় বাংলা কাগজ—

খবরের কাগজ বল্লে, "তবে সহ্য করতেই হবে!"

র‍্যাকটা বল্লে, "ঠিক, ভাই, ঠিক বুঝেছ।—

সহে যেই রহে সেই
এর চেয়ে গুণ নেই।
আমি কত ভার বহি
নীরবে, কথা না কহি।

গাদাগাদি ছেঁড়া বই
পুরনো কাগজ লই—
পিঠে, কাঁখে, কোলে করে,
সহে যাই ধৈর্য্য ধরে।

খবরের কাগজের মাঝখানে ছিল আধখানা একটা আল্‌গা পাতা। সে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল—"উঁহুঁ—সে হবে না—উনুনে আগুন দেওয়া হবে আমাকে দিয়ে? কী ভয়ানক।" সে ভীষণ খস্‌খস্‌ করতে লাগ্‌ল।

খবরের কাগজের র‍্যাকটা গম্ভীর গলায় বল্লে, "তেজ দেখিয়ে লাভ কি বাপু, তোমার এখন নিরুপায় অবস্থা।"

আল্‌গা পাতাটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"নিরুপায়? নিঃ (নাই) উপায় যাহার। কেন উপায় নেই? উপায় আছেই আছে। উপায় করে নিতে হবে—ঐ জানলা দিয়ে সট্‌কান দেব"—

সে বিরাট একটা ঘাই মেরে জানালার কাছে গিয়ে পড়ল। তারপর একটা দমকা হাওয়া আসতেই সে জানলা গলে রাস্তায় এসে পড়ল এবং সর্‌ সর্‌ খস্‌ খসর্‌ করে ঘসড়ে ঘসড়ে এগিয়ে চল্‌ল—

"হেইও মজা।
দেখ্‌ব এবার জগৎখানা
কাঁই না-না-না, কাঁই না-না-না!"

বগল বাজাতে বাজাতে খবরের কাগজের আলগা পাতাটা রাস্তায় এসে পড়ল। উড়তে উড়তে ছুটতে ছুটতে সে একটা কোণে এসে দাঁড়াল।

সেখানে বাতাসটা পাক খাচ্ছে আর একদল শালপাতা,

একটা কাগজের ঠোঙা আর একটা ছেঁড়া খাম হাততালি দিয়ে তারিফ করছে।

খবরের কাগজের আলগা পাতাটাকে লক্ষ্য করে কাগজের ঠোঙাটা নাচতে নাচতে বল্‌লে 'ভায়া, একটু নাচো না হে।'

ছেঁড়া খামটা সহানুভূতি জানিয়ে বললে, "একটু জিরোতে দাও ওকে—দেখ্‌ছনা কিরকম হাঁফাচ্ছে।" ঠোঙাটার নাচ থামলে ছেঁড়া খামটা খবরের কাগজটাকে জিজ্ঞাসা করলে "মহাশয়ের নিবাস ?"

খবরের কাগজটা "নিবাস" কথাটার মানে জানে না—ভাবলে বুঝি বাসের কথা হচ্ছে—তাই বললে, "আজ্ঞে না আমি পায়ে হেঁটে আসছি—"

খামটা বিকট হেসে উঠল, হোঃ হোঃ হোঃ ! কী কথার কি উত্তর—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কী কথার কি উত্তর—

বাড়ী কোথা ? আজ্ঞে, ঘোঁতা।

নামটি কি ? কাঁকুড়গাছি।

পিতার নাম ? কালোজাম।

খাচ্ছ কি ? পঞ্চানন সী।

বলেই আবার খামটা বিকট রকম হেসে উঠল।

ঠোঙাটা ধেই ধেই করে নেচে উঠল।

শালপাতারা হি-হি, হো-হো করে মাটীতে লুটোপুটি যেতে লাগ্‌ল।

যতক্ষণ বাতাস রইল সকলেই বেশ হাসিখুসি করে নেচেকুঁদে আমোদ-আহ্লাদ করলে—খবরের কাগজটা দলে বেশ ভীড়ে গেল। যেই বাতাস থেমে গেল, সবাই নেতিয়ে পড়ল।

খামটা বল্লে "যাই বলো, এর চেয়ে ঢের ভালো পুরীর সমুদ্রতীর। আমি সেখানে এক পোষ্টঅফিসে থাকতাম।

একজন আমাকে কিনে আমার পেটের মধ্যে একটা চিঠি ভরে ডাকবাক্সে ফেলে দিলে। ওঃ সে কি ঝঞ্ঝাট্ দাদারে। খানিক বাদে পিওন আমাকে তুলে একটা থলিতে ভরে বড় পোষ্ট-অফিসে নিয়ে গেল। সেই থলিতে আমার মত কত শত রয়েছে—সব মুখ আঁটা নীরব। জুল্ জুল্ করে পরস্পরকে দেখছিল খালি। বড় পোষ্ট অফিসে এসে আমাদের সবাইকে বাছাই করা হ'ল—তারপর দাদারে! ধপাধাঁই করে মোহর মেরে একেবারে শেষ করে ফেললে। তারপর আবার একটা থলিতে ভরে নিয়ে গেল ডাক-গাড়ীতে করে মেল ট্রেণে। আবার সেখানে বাছাই করে ষ্টেশণে ষ্টেশণে আমাদের কাউকে কাউকে নামাতে নামাতে চলল। এম্‌নি করে হাওড়া পৌঁছলাম।

তারপর আবার ডাকগাড়ীতে করে কলকাতার বড় পোষ্ট অফিস জি. পি. ও'তে—তারপর আবার ডাক গাড়ীতে চলে ময়লা চিট্‌চিটে থলেতে করে একটা এঁদো নোংরা ছোট্ট পোষ্ট-অফিসে। সেখানে আবার বাছাই হয়ে একটা পিওনের বগলের নিচে ঘামতে ঘামতে এসে একটা বাড়ীর সামনের লেটার বাক্সে বন্দী হ'য়ে রইলাম। সন্ধ্যা নাগাত একজন আমাকে মুক্ত করে উপরের ঘরে নিয়ে গেল সাজানো বৈঠকখানায়। ভাবলুম; ভাল জায়গাতেই এলুম—একটু বিশ্রাম নেব। কিন্তু হরি হরি! লোকটা খাঁ করে আমার পেট ছিঁড়ে ভিতরের চিঠিটা বার করে নিয়ে জানালা গড়িয়ে ফেলে দিলে। কি যে দুঃখ হ'ল ভাই, কি আর বলব—কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরালে পাজী।"

কাগজের ঠোঙাটা বললে, "ঠিকইত—আমি এককালে এক বিরাট ডাক্তারি বইয়ের পাতা ছিলাম। কত ছাত্র কত দরদ দিয়ে পড়েছে—লাল কালো রঙে রাঙিয়েছে—সকাল-সন্ধ্যে যত্ন করেছে। যেই ছিঁড়ে গেলাম আমাকে পুরনো

কাগজওয়ালার কাছে বিক্রী করে দিলে। তারপর আমাকে দিয়ে তৈরী করল ঠোঙা—মুড়ি-মুড়কির দোকানের তাকে ক'দিন রইলাম। তারপর একটা ছোট ঝাঁকড়াচুলো ছেলে আমাকে নিয়ে গেল দু'পয়সার মুড়কি শুদ্ধ। কী তার নরম হাত, কী তার সুন্দর রঙ। মুড়কি খাওয়া যতক্ষণ না শেষ হ'ল সে আমাকে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর খাওয়া হ'তেই রাস্তায় ফেলে দিলে। কথায় বলে,—

"অনেক রয়েছ বুকটি জুড়ে
কাল্‌কে ফেলব আঁস্তাকুড়ে।

কি বলো, ভাই, খবরের কাগজ? একটু রা কাড়ো—" খবরের কাগজ বললে, "ঐ কথা তোমার অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কালকে আমার কী আদর! আজ শুন্‌লুম কিনা আমাকে দিয়ে উনুন ধরাবে, হ্যাঁ।"

শালপাতা বললে, "ঐ একই গোত্র ভাই। সব নিমক-হারাম! আমার দশাই দেখনা। ছিলাম শালগাছে—ওঃ পৃথিবীর ধূলো ময়লার উর্দ্ধে—দুলতুম বাতাসের তালে তালে, নিয়ে এল বড় বড় বোঝা বেঁধে শহরে। কাঠি খুঁচিয়ে ঠোঙা তৈরী করে খাবার দেয় আমার বুক ভরে। খাবার খেয়ে ফেলে দেয় রাস্তায়—আঃ ছোঃ ছোঃ। কী ছিলাম, আর কী হয়েছি।"

খামটা বল্লে, "যতই বড় বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ো আর উহু-আহা করো, তোমাদের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। বাতাস না হ'লে উপায় নেই। তা ছাড়া আজকাল ছেঁড়া কাগজের যা কদর, দেখতে পেলেই থলে ঘাড়ে কাগজ কুড়িয়ে ধরে নিয়ে যাবে। তোমাদের শালপাতাগুলির ত' সে ভয় নেই।"

খবরের কাগজ শিউরে উঠে বললে, "কাগজ-কুড়িয়ে?

কাগজ-ধরা আবার আছে নাকি ? ছেলে ধরাদের আত্মীয় বুঝি তারা ? কাগজ কুড়িয়ে তারা কী করে ?”

ঠোঙা হোহো করে হেসে উঠল—তাও জানো না ? তাও জানোনা ? হ্যাহ্যাহ্যা……

সব লিখেছে কাগজেতে দুনিয়ায় যা খবর যত—

কাগজ ধরার নাম শুনলেই কাগজগুলো থতোমতো।

“কি করবে জানো ? আজকাল কিছুই ফেলা যায় না—গায়ে ময়লা মেখে থাকলেও কাগজদের রক্ষে নেই—ঝুলি ভরে নিয়ে যাবে কাগজের কলে—সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে কাগজগুলো কুঁচিয়ে, পিষে, থেসে, মেখে নতুন মশলা মিশিয়ে নতুন শাদা কাগজ তৈরী করবে—”

খবরের কাগজ হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠল—ওগো আমার বুকে যে টাট্‌কা খবর—দুনিয়ার কত কি—দেশ বিদেশ, নদীপর্ব্বত, দ্বীপ-উপদ্বীপ—সমাজ, রাষ্ট্র, উত্থান-পতন—এসব কেউ আর পড়বে না—”

এমন সময় দু’জোড়া পায়ের শব্দ আসতে লাগল সেই দিকে ধুপ্‌ধুপ্‌ ধুপ্‌ধুপ্‌……

থাম, ঠোঙা, খবরের কাগজ ভয়ে নেতিয়ে জবু সবু হয়ে পড়ে রইল।

দু’টি ছেলে ঘুড়ির লেজের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হ’ল। একটি ছেলে খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিল “বাঃ দিব্যি লেজ হবে’খন।” আরেকটি ছেলে ঠোঙাটা নিয়ে মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে মুখের কাছটা মুচড়ে ধরে দেওয়ালে সজোরে ঘা মারলে। ফটাস্‌ করে একটা শব্দ হ’ল আর ঠোঙাটা পেট ফেটে মরে পড়ে রইল। খবরের কাগজটার কিন্তু বরাৎ ভাল। তাকে না ছিঁড়ে ছেলেটা তার বিরাট

ঘুড়ির লেজে তাকে আঠাদিয়ে আটকে আকাশে ওড়ালো ঘুড়িটা।

হাওয়ার তালে তালে খবরের কাগজের প্রাণটা উৎসাহে দুলে উঠল চমৎকার। সুন্দর। গ্র্যাণ্ড। ফাইন।

এক একটা দমকা আসে বাতাসের আর ঘুড়িটা ওড়ে চড় চড় ফড়্‌ফড় আর তলায় খবরের কাগজটা দুলে দুলে দোল্‌খায় আর মনের আনন্দে গান গায়—

"বাঃ বাঃ বাঃ কী মজা ভাই
মজাদারের হাট-বাজার—
আকাশ-পথে নৃত্য করি
ডিগবাজি খাই দশ-হাজার।
শহর খানায় বহর দেখি
কলের চোঙা, বাড়ীর ছাদ
রাস্তা দিয়ে ছুটছে গাড়ী
ধাক্কা লেগে অকস্মাৎ।
কলকাতাটাই এত বড়
জগৎ তবে কী বিরাট
দেখতে হবে জগৎটাকে
এখন আমি লাটের লাট।"

কিন্তু এত সৌভাগ্য তার জীবনে বেশীক্ষণ সইল না। হাওয়ার তাল সামলাতে না পেরে ঘুঁড়িটা নীচু দিকে একটা গোঁৎ খেয়ে টেলিগ্রামের তারে এসে জড়ালো। লেজটা সেখানে জড়িয়ে রইল, ঘুঁড়িটা আবার উড়ল আকাশে।

তারের উপর গদীয়ান হয়ে বসে খবরের কাগজ বললে, "যাক্। এতদিন একটু উচ্চপদ পেলাম—জীবনে একটা স্থিতি হ'ল আমার।"

উনুনে আগুন ধরাবার জন্য যে প্রাণটা পোড়াতে হ'লনা: তাইতেই সে সুখী।

আরো আছে—

খবরের কাগজের জীবনের উন্নতির মূল কি সে সম্বন্ধে যদি এবার তোমাদের প্রশ্ন করি, তাহ'লে তোমরা সবাই যেন এক-বাক্যে বোলোনা—বাড়ী থেকে পালানো। খবর্দ্দার। তা'হলে তোমাদের পুলিসে ধরিয়ে দেব। বাড়ী থেকে পালালে বাবা মা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। মামা, কাকা ছাতা বগলে পাড়ায় পাড়ায়, থানায় থানায় খুঁজে বেড়ান—সে সব ভীষণ কেলেঙ্কারী। খবরের কাগজের ত' বাবা, মা, মামা, কাকা থাকেনা, তাই তার যা শোভা পায়, তোমার তা শোভা পায়না।

তবে হ্যাঁ, উচ্চাকাঙ্খা বিসর্জ্জন দিওনা। তাই ব'লে কিন্তু যেন টেলিগ্রামের তারের উপর গিয়ে বোসোনা। ওসব খবরের কাগজ, ঘুঁড়ি, কাক, ফিঙে, চড়াই ইত্যাদির শোভা পায়—মানুষের শোভা পায়না বুঝলে ?

—o—

—মৌচাক, ১৩৫৭

ভাঁড়ার ঘরের অন্ধকারে একটা ভ্যাপ্‌সানি গন্ধ—ঝাল-মশ্‌লার ঝাঁঝালো খোশবো—তেলের চিট্‌চিটে গন্ধ, আর ময়দা, আটা, চালের মিষ্টিবাসের ছিটে—কাঁচা তরকারির তাজা গন্ধ—তাছাড়া পুরোনো একটা এঁদো গন্ধ ও গুমোট্‌···

ইঁদুর্‌ ছুট্‌ছে অজানা সব শুঁড়িপথ ধরে শরীরটা লম্বা করে। কেউবা এক জায়গায় বসে কুটুর কুটুর করে কি যেন কেটে চলেছে। আরশুলারা গোঁফের বেওনেট্‌ খাড়া করে চতুর্দিকে কড়া নজর রাখছে। মাকড়শারা একমনে কোণে-কাঁদাড়ে জাল বুনে চলেছে···কেউবা ছোট ছোট শাদা গোল বালিশের মত ডিমের থলিটা বুকে নিয়ে বসে আছে। কাঁকড়াবিছে দাড়াশির মত দাড়া সামলে ডালের-ঘড়ার পাশে বা চালের-জালার তলাকার বিঁড়ের নিচে ঘুপটি মেরে বসে আছে। তেঁতুলে-বিছে অন্ধকার মেঝেতে পেতেনের তলায় যেন টানেলের নিচের রেলগাড়ীর মত মৃদুমন্দ গতিতে চলেছে। পিঁপড়েরা বড় কথা কয় না। তারা সার বেঁধে কেবল চিনি আর মিছরীর টুকরো বয়ে নিয়ে চলেছে। উচ্চিংড়েরা টিনের ক্যানেস্তারার গায়ে ত্রাং ত্রাং করে লাফাচ্ছে। আর···

দেয়াল বেয়ে বেড়াচ্ছে গোটাতিনেক টিকটিকি।

এ ছাড়া ঘুল্‌ঘুলির মধ্যে চড়াই পাখীর বাসা···তাদের খিড়কীরদিকে ভাঁড়ার ঘর, সদরে খোলা আকাশ। চড়ুই গিন্নী

ভাঁড়ারের সব খবরই রাখে। রাত্রে ভাঁড়ারের বাসিন্দাদের সঙ্গে দুটো একটা সুখদুঃখের কথা কয়। কাকের অত্যাচারের কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে···কত বাচ্চাই না তার ডাকাত কেলে কাকের পেটে গেছে! আহা!

তাছাড়া ভাঁড়ারে হঠাৎ আগন্তুক পুশী শয়তানী আছে অদূরে। ইঁদুরদের দু'চক্ষের বালাই···বিভীষিকা। কিন্তু যে দিন ভাঁড়ারের জানালা খোলা থাকে সেই দিনই তার দেখা মেলে। ক্বচিৎ কদাচিৎ সে আসে···যেদিন আসে সেদিন ইঁদুরদের ব্ল্যাক-আউট পর্ব—কেউ বড় সাড়াশব্দ করে না।

সেদিন হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেল ভাঁড়ার ঘরে। সেদিন সকালবেলাতেই মাসকাবারের বাজার এসে গেছে। রাঙা-বৌদি সব ভাঁড়ার দশটার মধ্যেই গুছিয়ে ফেলেছে। বেলা বারোটায় ভাঁড়ারের দরজায় চাবি পড়েছে। নীচে বড় আর কেউ নেই···ভাঁড়ার নিঃঝুম। মেজো টিকটিকিটা যেমন হুট্‌রো। সে গেছে নতুন কেনা সরষের তেল চাখতে। কিন্তু ভাঁড়ের কাণার কাছ থেকে যেই সে তার লোভী জিভটা বাড়িয়ে তেল চাখতে যাবে আর অমনি সড়াৎ করে সড়কে ঝাঁঝি সরষের তেলের মধ্যে গেল পড়ে। তারপর খানিক হাবুডুবু, চিৎসাঁতার, কাৎসাঁতার, খানিক বুড়বুড়ি তোলা, তারপরেই তেলের উৎকট ঝাঁঝে একেবারে মরে কাঠ। একটু বাদেই সে ভেসে উঠল তেলের উপর ঠিক যেন এক ক্ষুদে কুমীর।

এই সেদিন একটা টিকটিকি মরেছে জানলার পাল্লার ফাঁকে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে। ভাগ্যিস্ মেজো পিসী জানলা খুলতে গিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছিল। তাই না শেষ পর্য্যন্ত গঙ্গাজল দিয়ে পিসী শব শুদ্ধ করে দিলে। টিকটিকিটা অপঘাতে মরেও

গঙ্গাজলের স্পর্শে উদ্ধার হয়ে গেল। ভূত হ'তে হ'ল না তাকে। নয়ত অপঘাত মৃত্যুর ফলে ভূত হ'তে হ'ত তাকে··· নিশ্চয়ই।

এবার কিন্তু সকলের ভারী ভয় হয়ে গেল। আরশুলারা পেতেনের উপরের তাক থেকে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে কট্‌মট্‌
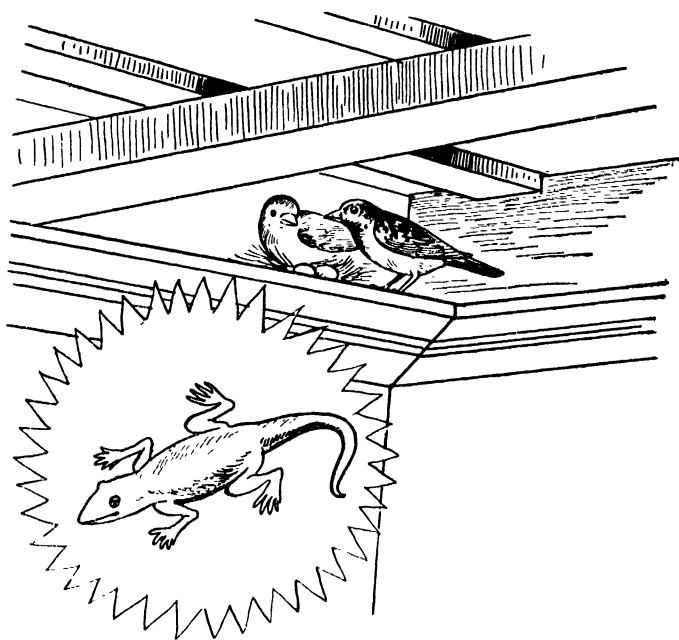
করে দেখলে সব···অনেকের খাড়া গোঁফ ভয়ে ঝুলে গেল। এদের মধ্যে কতকগুলো সাহেব আরসুলা ছিল, তারা আরো ভীতু···সুট্‌ সাট্‌ করে কে যে কোথায় লুকালো তার লেখাজোখা রইল না। ইঁদুররা ঘিয়ের বোয়েমের আড়াল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে। পিঁপড়েরা তেলের ভাঁড় বেয়ে উঠলো দেখতে। মৎলব টিকটিকির মাংস চেখে দেখবে··· কিন্তু সেই মরা টিকটিকির ছিরকুটি দাঁত দেখে আর তার পাথরের মত মরা চোখের কট্‌কটে কেমন-কেমন জ্যান্ত চাউনি

দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল। কয়েকজন বললে "আরে-রে অর চখ্ দুইট্যা যাঁতার মত ঘ্যুইর্ত্যাছে।"

একজন বললে, "দাঁত খামটি দিয়ে ও আমাকে ভ্যাংচি কাট্ছে।"

আরেকজন বললে, "মরা টিকটিকির জ্যান্ত লেজ দেখেছ? যাও দেখে এস···আমাকে লেজ তুলে শাসিয়েছে।"

ব্যস। ব্যস! ব্যস! ভাঁড়ার ঘর শুদ্ধু সবাই একেবারে স্পিকটি নট···ঠাণ্ডা।

চড়াই গিন্নী সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে এসে সবে ডিম দুটো কোলের কাছে করে বসতে যাবে, বড় টিকটিকিটা ধরা গলায় সব বৃত্তান্ত, আদ্যোপান্ত, আগাপাস্তলা, ডালপালা পাতাশুদ্ধ সব বললে।

উচ্চিংড়েরা বেজায় ঠ্যাঁটা, ঠোঁট কাটার মত বলে বস্‌ল···

"গাড়ী চাপা, কপাট চাপা, বিঘোরে মরণ,
অপঘাত হয় যদি মরার কারণ···
জীবাত্মা প্রেতাত্মা হয়, ইথে না সন্দেহ।
অতএব আজ রাতে বেরিও না কেহ॥"

মাকড়শাটা বলে উঠল, কেরে শাস্তর আওড়ায়? বলি, তোরা শাস্ত্রের কি বুঝিস্? ও সব শাস্ত্র অচল, অধম। অতএব আমার কথা শুনে রাখো···ভয়ং নাস্তি। ভূত টুত বাজে কথা! ও সব মানুষদের ফাজলামি। মানুষ-ভূত, গো-ভূত, ঘোড়া-ভূত ব্যস। জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ ওসব ছোট জীবদের আত্মাই নেই তা আবার প্রেতাত্মা।

কাঁকড়া-বিছে বললে, "সে কথা বিলক্ষণ।"

উঁইদের রাণী পেতেনের পায়ার বাসার মধ্যে বসে সব শুনছিল। সে বহুকষ্টে বেরিয়ে এসে বললে, "দেখো মাকড়শার-

পো, তুমি যা জানোনা সে বিষয়ে কথা বলতে এসো না। আমি সেই আদ্যিকাল থেকে বিস্তর মোটা মোটা বই কেটে খেয়ে ফেলেছি···যাকে বলে হজম করেছি। অনেক তত্ত্ব আমার জানা আছে। যেমন প্রেত-তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব, পরমাত্মাতত্ত্ব, তত্ত্ব-সিন্ধু, তত্ত্ব-বারিধি···সে সব থেকে আমার যা জ্ঞান হয়েছে তা থেকে বলছি···সকলেরই আত্মা আছে এবং সকলেরই প্রেতাত্মা হ'তে পারে। সু-কার্য্যের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি, কু-কার্য্যের ফলে নরক, প্রেতলোক। ভাল কাজ করতে করতে অপঘাতে মৃত্যু হলে স্বর্গ···মন্দ কাজ করতে করতে অপঘাতের ফলে ভূত হওয়া"···

ইঁদুরদের সর্দার মূষিক চন্দ্র বললে, "ঠিক বলেছেন উঁইরাণী। ভূত-তত্ত্ব সবাই বোঝে না···বড় কঠিন···কিন্তু সে তত্ত্বের একটা গোটা আলমারিশুদ্ধ বই আমি একাই সাবাড় করে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি তাই থেকে বলছি যে, শুধু জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ কেন···কাঠ, ইট, পাথরের পর্য্যন্ত আত্মা আছে, প্রেতাত্মা আছে। সমস্ত জগৎটাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়··· আত্মা আর প্রেতাত্মা।

এই পর্যন্ত শুনে ভাঁড়ার ঘরের সকলের মনের মধ্যে একটা শিরশিরে ভয় যেন শিউরে উঠতে লাগল। টিকটিকির গা ঘেঁষে আরশুলা এসে দাঁড়াল···তখন তারা দিশেহারা।

চড়াই গিন্নী ভাঁড়ার ঘরের ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একবার চোখ বুঁজে "রাম-রাম" আউড়ে গলা পরিষ্কার করে বললে, তাহ'লে মূষিকচন্দ্র, আপনার গল্পটা শেষ করুন।"

মূষিকচন্দ্র বললে, "ব্যাপার ভয়ের, কিন্তু জ্ঞানীর কাছে ভয় বলে কিছু নেই। আসল কথা হচ্ছে আমাদের ভাড়ার ঘরের অর্দ্ধেক অধিবাসী হচ্ছে প্রেতাত্মা আর অর্দ্ধেক হচ্ছে জীবাত্মা! যথা···

পেতেনের তলা থেকে কতকগুলো উঁই বলে উঠ্‌ল, "ভূতের গল্প বললে, পুশীকে ডেকে আনবো কিন্তু"...

ইঁদুর গোঁফে চাড়া দিয়ে বললে "কচি খোকা সব। ভূতের সঙ্গে দিনরাত ঘর করেও ভূতের ভয়ে সব মূর্ছা যাচ্ছে! প্রথমতঃ তোমরা সবাই টিকটিকিভূতের গল্প করছো...কিন্তু সব ভয় নিমেষে কেটে যাবে যদি বলি যে, তোমাদের অধিকাংশের আড্ডাটাই একটা আসল ভূত? অর্থাৎ ঐ পেতেনটা হচ্ছে একটা শাল গাছের ভূতের কঙ্কাল থেকে তৈরী?"

পেতনের কোথায় ঘুণ লেগেছিল সেখান থেকে শব্দ হ'তে লাগল কট্‌কট্‌ ঘুন্‌ঘুন্‌...উইরা পেতেনের পা চুষছিল...তারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, কাট্‌ কাট্‌ কা...ট্‌...পেতেনের তলা তার তাক আর তাকের উপরকার কেটোবাটা থেকে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে হরেক রকম জীব ঘরময় ঘুরঘুর করতে লাগল... পিঁপড়ে, তেঁতুলবিছে, কাঁকড়াবিছে, আরশুলা উচ্চিংড়ে...

মাকড়শা জালে বসে দোল খেতে খেতে বললে, "মজা মন্দ নয়! বেশ গাঁজার আমদানি করলে দাদা!"

মূষিকচন্দ্র কিঁচ্‌-কিঁচ্‌ করে বিশ্রী হেসে বললে "গাঁজা? জগদীশ বোসের নাম শুনেছ? তিনিই প্রমাণ করেছেন, গাছের প্রাণ আছে। গাছ মরলে কাঠ হয়—কাজেই কাঠ হল গাছের মড়া—মড়া মানেই ভূত। তা ছাড়া মাটি পোড়ালে হাঁড়ী, কলসী, জালা হয়। এরা মাটির ভূত।

উচ্চিংড়ে লাফদিয়ে কড়িকাঠে বসতে গেল। কিন্তু সেও তো কাঠভূত—কাজেই আবার এসে পড়ল মেঝেতে। সেখান থেকে কোণের দিকে চেয়ে দেখলে যে জালা-ভূত, হাঁড়ী-ভূত, কলসী-ভূত সব সরা আর হাত খোলা মাথায় করে, বিঁড়ের সিংহাসনে বসে নাদা পেট ফুলিয়ে কেমন বিশ্রী মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।

আরশুলারা আর অন্য জীবেরা বিশেষতঃ পিঁপড়েরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহস বজায় রেখেছিল কিন্তু হঠাৎ তেলের ভাঁড়ের মধ্যে বুড় বুড়, ভুড় ভুড়, চলাক্ চলাক্ শব্দ হ'তে লাগল—মনে হ'ল টিকটিকি ভূতের জিভটা যেন বিরাট হয়ে তেলের ভাঁড় চাট্‌ছে। তারপরই একটা বিরাট কুমীরের মত বিতিকিচ্ছিরি মুখ ভাঁড়ের কাণা থেকে উঁকি দিলে—ওরে ব্যস। চোখ দুটো যেন দুটো তেলের কূপী, দাঁতগুলো যেন পউষে-মূলোর পুঁজি। আর জিভটা যেন একটা বিরাট সর্ব্বজনীন কালীমূর্ত্তির লক্‌লকে জিভ।

চড়াই গিন্নী হঠাৎ চমকে উঠল একটা হৈ-হৈ শব্দে—ভাঁড়ার উলটে পালটে ইঁদুর আরশুলা টিকটিকি, উচ্চিংড়ে, কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলেবিছে এক বিশ্রী উৎপাত জুড়ে দিলে। পিঁপড়েরা ঘরের মেঝেতে কালো কালো বিরাট কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল। পেতেনটা দুমড়ো আড় হয়ে পড়ল এক্কেবারে হাঁড়ী, কলসী, জালার উপরে, টিন কৌটা বয়াম সব মড়মড়, দুম্-দাম্, ধপ্-ধপ্, ঠক্-ঠক্, ঠং-ঠাং, ঠন-নং, ঝন-নং ইদুরের কিঁচি-মিচি, টিকটিকির ঠিকঠিকির—উচ্চিংড়ের ত্রাং-ত্রাং লাফ—ভাঁড়ার ঘরে এক ভৌতিক বিপর্য্যয়।

দৌড়ে এলেন কত্তা, গিন্নী, বৌ-ঝি, ছেলে, বুড়ো—রাঙা বৌদি একগলা ঘোমটা দিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে চাবির রিং আচল থেকে ঝনাৎ করে বার করে, কুটুস করে তালা খুল্লেন। ছোট কত্তা টর্চ্চের আলো ফেললেন। আহা-হা। পেরেক্টা পড়েগেছে।

রাঙা বৌদি ঘোমটার আড়াল থেকে বললেন ফিসেফিসে গলায়,—"আজই মাসকাবারী এসেছে—সব ভেঙ্গে চূরে ভেস্তে পয়মাল।"

বড় কর্ত্তা বল্লেন, পেতেনটা ঠাকুরমার আমলের ঘুন ধরে ভেঙ্গে পড়ল এতদিনে।

বড় গিন্নী মোটা শরীরে হাঁপিয়ে গেছেন, ধপ্ করে মেঝেতে বসে পড়লেন, "বলি এখন উপায়।"

* * * *

কিন্তু কেউ ওরা জান্‌ল না টিকটিকি ভূতের কথাটা। চড়াই পাখী ওদের কয়েকবার জানাল, কিন্তু ওর ঐ চিপ্‌চিপে ভাষা কি মানুষে বোঝে? বুঝলে, আসল কথাটা জানতে পারত।

—মৌচাক, ১৩৬৭

—০—

কাগজের নৌকা

বাদ্‌লার দিন। সকাল থেকেই ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি স্বরু হয়েছে। আকাশ অন্ধকার। গুড়্ গুড়্ করে মেঘ ডাক্‌ছে। মাঝে মাঝে বজ্রও হাঁকছে—।···

জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট্ আস্‌ছে। বই খাতা গুটিয়ে আমরা বাইরে গাড়ী বারান্দার তলায় জমা হলাম।

রাস্তা দিয়ে ইতিমধ্যেই রীতিমত জলের স্রোত বইছে। রাস্তাটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডুবে গেল।

সাম্‌নের বাড়ীর গণ্‌শা, ফট্‌কে, ঘোঁতা ওরা সব মোচার খোলা জলে ভাসাচ্ছে। শাঁ শাঁ করে সেগুলো জলের স্রোতে খাণিক চলে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে ডুবে যাচ্ছে—বা কোন কিছুতে ধাক্কা লেগে উল্‌টে যাচ্ছে। তাই নিয়ে কী তাদের অট্টরোল।

আমাদেরও একটা কিছু চাই। বড়দা ভিজে ভিজে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌লো। আজ খিঁচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা···তোফা ভোজ। স্কুল আজ বস্‌বেই না—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। রাস্তায় যা জল, ছেলেরা স্কুলে যাবে কি করে।

রুনু বল্‌লে, "ছোড়দা, এসো আমরা নৌকা বানাই—কাগজের নৌকা···"

খবরের কাগজ একখানা জোগাড় করা গেল। তা দিয়ে গোটা তিনেক বেশ বড় নৌকা তৈরী হ'ল। কিন্তু জলে ছাড়তে

গিয়ে দেখা গেল যে একপেশে হ'য়ে যাচ্ছে। ঝুনু দিলে তার মধ্যে একটা ইটের টুক্‌রো বসিয়ে—ব্যস্‌ নৌকো সিধে ভেসে চল্‌লো তীর বেগে। মুদির দোকান পেরিয়ে ঐযে চলেছে শোঁ শোঁ ঐ যাঃ! গ্যাসের থামে লেগে ডুবে গেল!

ওঃ কী আফ্‌শোষ! ভরাডুবি হ'লেও বোধ হয় এত আফ্‌শোষ হ'ত না। তা ছাড়া গণ্‌শা, ফট্‌কে, ঘোঁতা ওদের বাড়ীটাই যে পেরিয়ে গেল না!

বিশেষ করে ওদের সঙ্গে আমাদের ছিল আড়াআড়ি। আমরা ঘুড়ি ওড়ালে ওরা আমাদের ঘুড়ি কেটে দিত। যত ভাল করেই মাঞ্জা দিই, ওদের ঘোঁতা আমাদের ঘুড়ি কাট্‌বেই। আমরাও ওদের সূতো ধরতাম। আমাদের ছাতে ওদের ঘুড়ি গোঁত খেয়ে পড়লে ছিঁড়ে নিতাম। তাই নিয়ে রীতিমত ঝগড়া, মারামারি পর্যন্ত বাধ্‌তো।

আমাদের কাগজের নৌকা দেখে ওরা আবার কাগজের নৌকা তৈরী করতে লেগে গেল। আমরাও যেখানে যা কাগজ জোগাড় করি সব নিয়ে নৌকা করি। দু'দলের নৌকা পাল্লা দেয়—কারটা বেশী দূর যায়। সে এক অদ্ভুত নেশা।

এদিকে কাগজের অভাব পড়ে গেল। ওরা কিন্তু সমানেই নৌকা তৈরী করে চলেছে। আমাদের যদি দেরী হয় ত ঠাট্টা করে ছড়া কাটে—

"নৌকো নৌকো কাগজের নৌকো
কাগজ কাটো চৌকো চৌকো
ভাঁজ করো, ভাঁজ করো জল্‌দি ভাই
নৌকো চড়ে নওগাঁ, যাই—"

রুনু, ঝুনু ও ছড়ায় উত্তর দেয়

আমাদের নৌকোর তীরের গতি
আমাদের নৌকো প্রজাপতি
তোদের নৌকো মোদের প্রজা
পথ ছাড়্ পথ্ ঐ যায় রাজা—"

সত্যি সত্যিই আমাদের নৌকো ওদের নৌকোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে যায়—দূরে দূরে···
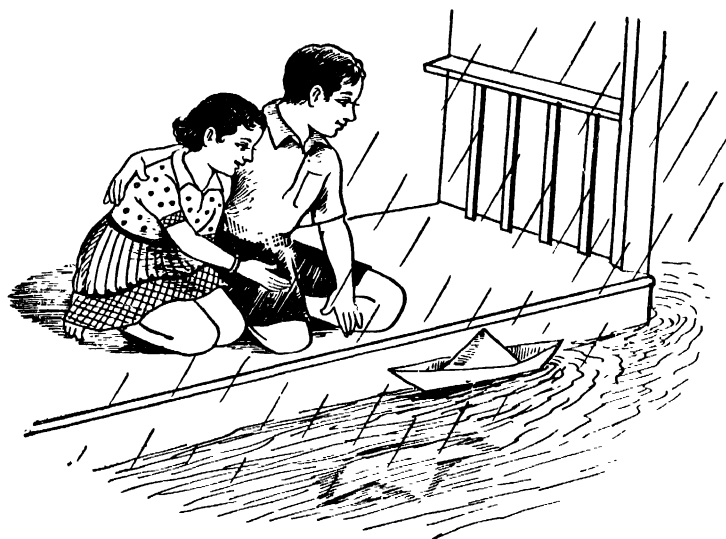
শৈশবের সে মধুময় স্মৃতি আজ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে চোখের আগে। সে দিনের সে আনন্দ, সেদিনের সে উল্লাস! তারমত আনন্দ কী জীবনে আর কোন দিন উপভোগ করতে পেরেছি? বোধ হয় নয়।

সেদিন বাদ্‌লাটা একরকম আনন্দেই কেটেছিল—কিন্তু সন্ধ্যার সময় থেকেই সুরু হ'ল নিরানন্দ।

মেজদার ঘরে ডাক পড়লো আমাদের। কেন যে ডাক

পড়লো তা জানাছিল আমাদের। ডাক যে পড়বেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না।

মেজদা আমাদের দেখেই বারুদের মত-ফেটে পড়লেন, "খাতার পাতা ছিঁড়েছে কে ?"

আমাদের বুকের রক্ত সে স্বর শুনে জমে হিম হ'য়ে এল। মেজ্‌দাকে বাড়ীর সকলেই খুব ভয় করতো। কিন্তু ইদানীং তাঁর শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি বড কারুর সাতে-পাঁচে থাকতেন না। নিজের লেখা পড়া নিয়েই থাকতেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। নানারকম বৈজ্ঞানিক-গবেষণায় তাঁর সময় কাট্‌তো। মাঝে ম্াঝে খবরের কাগজেও তাঁর লেখা ছাপা হ'ত।

মেজদার খাতা থেকে পাতা ছেঁড়বার সময় আমাদের মনে হয়নি যে খাতাটা তেমন দরকারী। সেটা জঞ্জালের ঝুড়ির মাধ্যই গোঁজা ছিল। এখন দেখলাম মেজ্‌দার সামনে টেবিলে সেই খাতাটা।

আমাদের যথেষ্ট ভয় হ'ল। ভয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিলাম। তিন জনেই সমস্বরে বল্‌লাম, "আমরা ত' জানি না মেজদা।"

মেজ্‌দার স্বরটা হঠাৎ খুব নরম হ'য়ে এল। বল্‌লেন, "আচ্ছা যা তোরা। কেষ্টাকে ডেকে দে।" কেষ্ট আমাদের বাড়ীর বুড়ো চাকর। সে মেজদার ঘর পরিষ্কার করতো। বুঝ্‌লাম এবার কেষ্টাকে জেরা করা হ'বে।

কেষ্টাকে মেজদা ভীষণ বক্‌লেন, তাকে বাড়ী থেকে দূর করে দিলেন। এই নিয়ে বাড়ীতে খুব হৈ চৈ হ'ল। মা মেজ্‌দাকে বার বার বল্‌লেন, "ওরে কেষ্টা বোধ হয় কাগজ ছেঁড়েনি। তুই শুধু শুধু ওকে জবাব দিলি !"

মেজদা শুধু হুঙ্কার দিলেন, "নাঃ ছেঁড়ে নি !"

এরপর মাস দু'য়েকের মধ্যেই মেজ্‌দা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মেজদার মৃত্যুতে সমস্ত বাড়ীটাই যেন থম্‌থমে হয়ে গেল। আমাদের বংশের একমাত্র কৃতী-সন্তান মারা গেলেন।

বড় হ'য়ে মেজদার লেখাগুলো ছাপাতে দেব বলে সংগ্রহ করে একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলাম। সে গুলো সে কয়েকদিন ধরে দেখে আমাকে ডেকে পাঠালো। তার বাড়ী গিয়ে দেখি টেবিলের উপর সেই খাতা—যেটা থেকে পাতা ছিঁড়ে আমরা বাদ্‌লার দিনে নৌকা তৈরী করেছিলাম।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, "এর বাকী পাতাগুলো কোথায় বলো দেখি! এ ত' একটা অপূর্ব্ব আবিষ্কার। কিন্তু শেষের পাতা কটাতেই সব যুক্তিতর্ক থাকবার কথা। খুঁজে দেখো ত!"

আমি চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগ্‌লো। কী যে বেদনা বুকের মধ্যে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল তা কি বল্‌বো।

তারপর বন্ধুর কাছে সব খুলে বল্‌লাম! বন্ধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "হায়, হায়! কি অমূল্য জিনিষই না নষ্ট হ'য়ে গেছে। বেঁচে থাক্‌লে আজ তোমার মেজ্‌দা জগতে একটা স্থায়ী কীর্ত্তি রেখে যেতেন!"

বিষণ্ণ হৃদয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। একথা আর কাউকে মুখ ফুটে বলিনি। রুনু, ঝুনু এখন বড় হ'য়েছে। ছেলেমেয়ের মা হ'য়েছে তারা। কিন্তু ব্যথা পাবে বলে তাদের কাছেও আমি একথা গোপন করে রেখেছি।

ছেলেবেলায় অলস খেলায় নিজের অজান্‌তে কী নিষ্ঠুর অন্যায় করেছিলাম তার ব্যথা শুধু আমি একাই ভোগ করছি।

"কাগজের নৌকা" নামটা দেখে অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। তাই তোমাদের কাছে বলে ফেললুম। আনন্দের নেশায় পাছে তোমরাও এরকম কিছু করে ফেলো, তাই তোমাদের সাবধান করবার জন্যই এ গল্প কেবল তোমাদের কাছেই বল্‌লুম।

—০—

নাম বলতে বাধা আছে, তাই নাম দিলুম তাঁর লটারি-বাবু।

চৌরঙ্গীর মোড়ে স্যুট্‌কেশ হাতে ঝুলিয়ে ভদ্রলোক আস্‌ছিলেন, আমায় দেখে নমস্কার করে বল্‌লেন, "মশাই, বল্‌তে পারেন এখানে কোথায় লটারির টিকিট্‌ বিক্রি হয়!"

নিজের অত বড় একটা অজ্ঞতার কথা হঠাৎ টের পেয়ে মনটা বড় মুষ্‌ড়ে যায়—"কৈ জানি না ত! কখনো লটারির টিকিট কিনিনি।"

ভদ্রলোক অবাক হ'য়ে বলেন, লটারির আড়তে বাস করেন আর কখনো লটারির টিকিট্‌ কেনেন নি—ওঃ আপনার কানঘেষে কত বড় বড় সব চান্স্‌ চলে যাচ্ছে—হাজার হাজার লাখ্‌ লাখ্‌ টাকা!" লোকটী বলতে থাকেন, আমি লটারির টিকিট্‌ কিন্‌ব বলে সুদূর মফঃস্বল থেকে ট্রেন, ষ্টীমার ভাড়া করে কলকাতায় এসেছি—জানেন, আমার কোষ্ঠি-পত্রে এই বৎসরে অর্থাগম যোগ আছে। এ সুযোগ যদি ছাড়ি চিরকাল নির্ধন, কাঙাল হ'য়ে জীবন কাটাতে হ'বে। আর এই যে দেখ্‌ছেন আমার হাত—" এই বলে' তিনি তাঁর ডান হাতখানা আমার সামনে মেলে ধরে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে সেখানকার একটা অস্পস্ট রেখা দেখিয়ে বলতে থাকেন—"এই যে রেখা দেখ্‌ছেন, এটা 'হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি যোগ-রেখা'—ভাল জ্যোতিষী বলেছে—ভুল নেই এতে একটুও। কাজেই এখন

যদি এই সব সুযোগগুলি না নিই ত' বড় লোক হ'ব কি করে? আপনি কি বলেন?"

আমার বক্তব্য আর মুখ থেকে বেরোয় না। মনে মনে ভাবি লোকটার বড়লোক হ'বার কী অদম্য উৎসাহ।

যা'হোক্ এবার নিজের কাজে যাবার তাগিদ অনুভব করি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করা আর পোষায় না। সবিনয়ে লটারি-বাবুকে নিবেদন করি—"আচ্ছা আসি মশাই—আপনি অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করে নিন্।" বলেই তাঁর দিকে পিঠ ফিরাই।

সেই দিনই সন্ধ্যায় গলির মোড়েই দেখা হয় আবার লটারি বাবুর সঙ্গে। আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বলেন, 'থাকা হয় কোথায়?"

নম্বর জেনে ভদ্রলোক আশ্চর্য হ'য়ে বলেন, "আরে, আমার মামাশ্বশুর রামকানাই বাবুর পাশের বাড়ী যে সেটা। আমিও ত মশাই, মামাশ্বশুর বাড়ীতে উঠেছি। আজ কয়েকটা লটারি কিনেছি। মাস খানেক এখানে থেকে, লটারিগুলোর রেজাল্ট্ বেরুলে টাকাগুলো তুলে একটা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রেখে তবে বাড়ী যাব।"

পরদিন সকালবেলা দেখি লটারি বাবু এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের বৈঠকখানার দরজায়। মুখে ভদ্রতা দেখাই—"আসুন, আসুন বসুন—"

"দেখুন আমার এই হিসাবটা কষে' দিন ত—" বলে, তিনি খাতা ও পেন্সিল এগিয়ে দেন।

আমি কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক হুকুম করেন—'লিখুন—আইরিশ চ্যারিটি সুইপ্ পঞ্চাশ হাজার, পোর্টুগীজ্ অ্যানুয়েল সুইপ্ বিশ হাজার, ইণ্ডো ব্রিটিশ লটারি ক্লাব সত্তর হাজার পাঁচ শ'......"

ফর্দ চলল তিনপাতা ধরে। যোগ দিয়ে ত্রিশ লক্ষ টাকা দাঁড়াল।

ভদ্রলোক বললেন—"এইবার ক্লাবের কমিশন বাদ দিন ১৫৲ টাকা শতকরা।"

আমার এইবার হাসি পেয়ে গেল। এ যে গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি। ভদ্রলোক আমাকে হাস্‌তে দেখে আরো চটে গিয়ে বল্‌লেন, "হাসবেন বৈকি, হাসবেন না! আমার পকেট মারবে গুণ্ডো গুলো আর আপনি হাস্‌বেন। সাধে কি আর আমাদের উন্নতি নেই।" বলে কাগজপত্র ঝট্‌পট গুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা চায়ের অবশিষ্ট যেটুকু বাটীতে ছিল এক চুমুকে শেষকরে ভদ্রলোক চলে গেলেন। যাক্ বাঁচা গেল।

তিন দিন পরে ভদ্রলোক একদিন রবিবার বাজার করে ফিরছেন, আমার সাথে দেখা। হাসি হাসি মুখে লটারি বাবু জবাব দেন, কাল একটা ছোটখাট লটারি পেয়েছি। লাকি স্টার্ট্—অবশ্য প্রাইজটা কন্‌সোলেশ্যন, মাত্র ৫৲ পাঁচ টাকা

কিন্তু ওরি দাম লাখটাকা—বউনি, মশাই বউনি—ধনাগম যোগ রয়েছে কোষ্ঠী-পত্রে, হাতে রেখা রয়েছে হঠাৎ ধনপ্রাপ্তির, ওসব কি তবে মিছে হবে !”

ভদ্রলোক বলেন, “মশাই—নিশ্চয়ই ব্যাটারা জুয়াচুরি করেছে নয়ত আমার নাম ওঠেনা—আমার হাতে হঠাৎ ধন-প্রাপ্তির রেখা রয়েছে স্পষ্ট—কোষ্ঠীপত্রে ধনাগম যোগ রয়েছে আর আমার নাম ওঠে না—”

ভদ্রলোকের প্রথম নিষ্ফলতা দেখে দুঃখ হয়। কিন্তু এর পর থেকে তাঁকে দৈনিক তিন চারটে নিষ্ফলতার ধাক্কা সহ্য করতে হ’ত। ক্রমে সব লটারি খেলা শেষ হ’ল। ভদ্রলোক কোন লটারিতে কিছু পাননি—কেবল সেই যে প্রথম পাওয়া পাঁচ টাকা সেইটা বাদ।

দিস্তা দিস্তা লটারির টিকিট তিনি যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেও কিছু করতে পারলেন না। রাশি রাশি টাকা ব্যয় করে লটারির টিকিট্ কিনে সর্বস্বান্ত হয়ে ভদ্রলোক এখন পথে পথে ঘুরে বেড়ান পাগলের মত। কেউ লটারির টিকিট্ কিন্‌লে তিনি তাকে বোকা বলে গালাগালি দেন।

এখন আর তিনি লটারি বাবু নন্। এখন তাঁর নতুন নামকরণ করা হয়েছে লটার্যরি বাবু (লটারি+অরি), তিনি এখন লটারির শত্রু।

লটারির টিকিট কিনেও তোমরা লটারি পাওনা কেন জান ? লটারী বাবু ধারে কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি এমন বিশ্রী রকম অপয়া যে লটারি কিছুতেই তোমরা পাবে না যদি তিনি ধারে কাছে থাকেন। কাজেই তোমাদের সাবধান করে দিলুম টিকিট কিন্‌বার সময় ভাল করে আশপাশ দেখে নিও, নয়ত শেষটা পস্তাতে হবে।

বাব্‌লুর আজ ভারী আমোদ। মা বললেন, "আসছে রবিবারে বাব্‌লুর জন্মদিন।"

একটা হাত কোমরে দিয়ে, একটা হাত মাথায় দিয়ে বাব্‌লুর সে কি তিড়িং তিড়িং নাচ। বাড়ীশুদ্ধ সবাই ত' হেসেই খুন!

পরের দিন হ'ল বৃহস্পতিবার। সকালে বিছানা থেকে উঠে বাব্‌লু দেখ্‌লে, মেনি বেড়ালটা পাশতলায় লেপের মধ্যে কুঁক্‌ড়ি মেরে শুয়ে আছে। অন্যদিন হ'লে সে তার গোঁফ ধরে টান দিত। কিন্তু আজ মন খুশীতে ভর্ত্তি। সে মেনি বেড়ালটার কানে কানে বল্লে—"ছোট্ট মেনি, ছোট্ট মেনি—রবিবারে আমার জন্মদিন।"

ছোট্ট মেনি তার পিট্‌পিটে চোখ তুলে একবার বাব্‌লুর মুখের দিকে চাইলে। তারপর নাক কুঁচ্‌কে—"মেঁউ" বলে তিড়িং করে মেঝের উপর নাম্‌ল। তারপরে পাগুলো টেনে আলিস্যি ভেঙে ল্যাজ খাড়া করে দৌড় মার্‌ল।

বাব্‌লু বাসী ইজের জামা ছেড়ে দালানে এসে দাঁড়াল। রোদে সারা দালানটা ঝল্‌মল্‌ করছে। দাঁড়ে বসে টিয়াপাখীটা দোল্‌ খাচ্ছে। তার গায়ের রং রোদে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। বাব্‌লুকে দেখে সেটা ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডাক্‌তে ডাক্‌তে মাথা নেড়ে দুল্‌তে লাগ্‌ল। তারপরে বল্‌লে—"বাল্লুবাবু নমস্কার ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ!"

বাব্‌লু এবার নীচে ছুট্‌ মারল। এক জায়গায় স্থির হ'য়ে থাকা তার কুষ্ঠীতে লেখা নেই। বাইরের ঘরে মায়া আর মুকুল পড়্‌তে বসেছে—বাব্‌লু এসে ঢুক্‌লো—"কি হচ্ছে তোমাদের ?"

মায়া বাব্‌লুর দিদি ! মুকুল হচ্ছে দাদা।

বাব্‌লু মায়াকে বল্লে—"দিদ্‌মণি, দিদ্‌মণি রবিবার কি বার রে ?"

মায়া আর মুকুল দু'জনেই হেসে ওঠে। মুকুল বলে—"রবিবার ভাই—এ মাসে মঙ্গলবারে পড়েছে।" আবার দু'জনের হাসি।

বাব্‌লু বেচারী হক্‌চকিয়ে যায়। এরা সবাই হাসে কেন !

মায়া বলে—"রবিবারে কি হ'বে বাব্‌লু ?"

বাব্‌লু বলে, "বাঃ তাও জানো না বুঝি ? রবিবারে আমার জন্মদিন। মা বলেছে।"

মা বুন্‌ছিলেন একটা লাল উলের গেঞ্জি। বাব্‌লু এবার সেখানে গিয়ে হাজির।

—"মামণি, রবিবার কি বার ?"

—"কেন্‌রে দুষ্টু।

—"বাঃ, রবিবারে জন্মদিন না ?"

—"ওঃ, তাইত' ! তাইত' ! সোণা ছেলে—আমার সব মনে করে রেখেছে।" এই বলে বাব্‌লুর মামণি বাব্‌লুর গালে একটা চুমো দেন।

মামণি ছেলের কথা শুনে হাসেন।......

ক্রমে ক্রমে দিন গেল চলে। কাল রবিবার ! বাব্‌লুর নাচ আর আমোদের বিরাম নেই। কে কি উপহার দেবে—

নতুন জামা—নতুন কাপড়—মায়ের বোনা লাল গেঞ্জি—ভূষণ-বাবুর দেওয়া নীল পশমের টুপি!

উত্তেজনায় আর হট্টগোলে তার ঘুমই আসে না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বাব্‌লু ওপরের ঘরে শুতে আসছে—টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে। মামণি নীচে গেছেন এখুনি আস্‌বেন। বাব্‌লুর মাথায় এক খেয়াল চাপ্‌ল। জন্মদিনে সে ছ' বছরে পড়বে। সবাই বল্‌ছে সে বড়ো হবে। বড়ো হওয়া মানেই ত' মাথায় বড়ো হওয়া। সে তবে আজ একটা মাপ নিয়ে রাখ্‌বে। কাল দেখ্‌বে সে কতটা বেড়েছে।

তার সামনে মোমবাতি জ্বল্‌ছে! পিছনে দেওয়ালে কালো ছায়া—নড়্‌ছে চড়্‌ছে। এইত' মাপবার বেশ সুবিধা।—সে খাট থেকে মেঝেতে নেমে পড়্‌ল। তারপর দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেওয়ালে তার ছায়া পড়েছে। সে পেন্‌সিল নিয়ে ছায়াটার মাথার কাছে একটা দাগ দিলে। কাল ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে মাপ নিলেই হ'বে। বাব্‌লু মেঝেতে একটা চিহ্ন করে রাখলে।

তারপর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মামণি ঝিয়ের সঙ্গে কি কথা বল্‌ছেন। বাব্‌লু এক ছুট্টে বিছানায় এসে ভাল মানুষটির মত চুপ্‌টি করে শুয়ে রইল।

সকাল থেকে বাব্‌লুর আমোদে আর চীৎকারে বাড়ীতে তিষ্ঠানো দায়—"আজ তার জন্মদিন—মশাই আজ তার জন্মদিন।"

রাস্তা দিয়ে হরেক রকম ফিরিওলা হেঁকে যায়।—"শিশি বোতল কাগজ বিক্রী।"—

—"বসুমতী, ভারী খবর—লণ্ডনে গোলটেবিল্—ঠঠনে গণ্ডগোল—দুই পয়সায় ভবের খবর"—

বাব্লু ডাকে, "এই খবরওলা, আজকের খবর কুছ্ লেখা হুয়া নাকি? আজ আমার জন্মদিন—বুঝতে পারলে হ্যায়।"

খবরকাগজ-ওয়ালা দাঁত বের করে হাসে।......

...সমস্তদিন কেক্, চকোলেট্, টফি, লজেঞ্জস্, মিঠাই, মাছের মুড়ো, মাংসের কচুরি! বাব্লুর দৌলতে বাড়ীশুদ্ধ সকলের ভূরিভোজ। হাস্য-আমোদ-ফূর্ত্তি-খেলা। দিনটা বেশ কেটে যায়। সন্ধ্যার বাব্লু সব উপহার পেলে—কি সুন্দর-সুন্দর ছবির বই—মজার খেল্না—মহিতোষ বাবুর গান—মায়ার নাচ!

...ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে সঙ্গে সব অতিথি বিদায় নিলেন। বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া বাকী। বাব্লুর মামণি বাব্লুকে বিছানায় শুইয়ে রেখে চলে গেলেন নীচে। লেপটা গায়ে টেনে দিয়েই ছ্যাঁৎ করে একটা কথা বাবলুর মনে পড়ে গেল। কৈ মাপ নেওয়া হয়নি ত'! সে জন্মদিনে কতখানি বেড়েছে তাত' দেখা হ'ল না।

কিন্তু দমবার পাত্র বাবলুচাঁদ নয়। তড়াক্ করে বিছানা থেকে উঠে সে ড্রয়ারের মধ্যে হাতড়াতে সুরু করে দেয়। কলকাঠি সব তার জানা। অতি সহজেই দেশলাই আর মোমবাতি বেরিয়ে এল। কাঠের সিন্ধুকটার ওপর মোমবাতিটা রেখে বাবলু দেশলাইয়ের কাঠি ঘসে 'খাঁস্স্' করে আলো জ্বলে ওঠে। সমস্ত ঘরটি যেন মুহূর্ত্তে জেগে উঠল। বাতিটা জ্বেলে বাবলু সেই দাগের কাছে দেওয়ালে গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ এইত' সেই দাগ। বাবলু সোজা হয়ে দেওয়ালের গা ঘেঁষে

াড়াল! কিন্তু এ-কি? সে এত ছোট্ট হ'য়ে গেছে।
ালকের দাগ ত' ঐ ওপরে রয়েছে। সে তবে দিন দিন ছোট
য়ে যাচ্ছে! এমনি করে কমতে থাকলে দাদার মত বড় হওয়া
ত' চুলোয় যাক্—সে যে কম্‌তে কম্‌তে একেবারে ফুরিয়ে ফক্কা
'য়ে যাবে। কথাটা ভাবতে গিয়ে বাবলুর চোখে জল এসে
গল—সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেল্‌লে।...

...কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার গলা বুজে আসতে লাগল—
ামা ইজের ভিজে সপ্‌সপে হ'য়ে উঠল—তার কপালে ফোঁটা
ফোঁটা ঘাম দেখা দিলে।

এমন সময় মামণি এসে হাজির। "ওমা—বাতি জ্বেলে কি
করছিস্‌রে—পুড়ে মরবি যে! "তারপর বাবলুর কাছে এসে
—"ওমা কাঁদ্‌ছিস কেন? কি হয়েছে রে? আজকের দিনে
কি কাঁদ্‌তে আছে? কি হয়েছে বল্‌না।"

বাবলু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মায়ের গলা জড়িয়ে তার দুঃখের

কথা সমস্ত খুলে বল্লে। মা শুনে ত' হেসেই আকুল
"এরিজন্যে কান্না! ও বোকা ছেলে—এই দেখ আমি তোমা
সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এইবলে বাবলুর মামণি বাব্লুকে দেখিয়ে দিলেন যে, কেম
করে ছায়া ছোট ও বড় হয়। আলো যদি দূরে থাকে ত
দেয়ালের ছায়া ছোট হয়—কাছে থাক্লে বড় হয়। সেদি
আলো ছিল টেবিলে। আজ আলো আছে সিন্ধুকের উপর
টেবিলটা সিন্ধুকের চেয়ে দেয়ালের বেশী কাছে।

সব বুঝে বাব্লুর সে কি হাসি। আলোর খুব কা
সরে এসে সে দেয়ালের কাছে দাঁড়াল ছায়া করে। তারপ
বলে "হাঃ হাঃ হাঃ আমি কত বড় হয়েছি। দাদার চেয়ে
বড়, হিঃ হিঃ হিঃ।

"রাণু, তোমাদের পড়বার টেবিলের ওপর দুটো টাকা ছিল—পাঁচ মিনিট আগে—দেখেছ তোমরা ? খোকন ?

খোকন তা'র ঝাঁকড়া চুলের গোছাটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে ঢোক গিলে বল্লে,—"দুটো টা-কা ? বাঃ দেখলে বুঝি আমি বলতাম না !"

রাণুর চোখ ছল্ছল করে উঠল, বলে—"না পিসীমা, আমরা ত' এই বইখাতা গুছোলাম। টেবিলে থাক্‌লে আমরা দেখতে পেতুম।"

পিসীমা ভাবতে ভাবতে বললেন—"তবে গেল কোথা এই ভাবি। এই প্রথম নতুন নয়, পরশু গেছে দাদার ঝরণা-কলম, গেল বুধবার তোদের মায়ের একগাছা চুড়ি—ও-মাসে মহিতোষের টাকার থলি—তোর হেয়ার পিন্—এতো ভারী ভাবনায় পড়া গেল !"

বিধু ঝি ওপর থেকে নেমে এসে বললে—"নাঃ দিদিমণি—সব খুঁজে এনু—আলমারীর নীচে, খাটের তলায়, দেরাজের পাশে, টেবিলের টানায়, পা-পোষের তলায়—কোথাও নেই !"

পিসীমা বললেন—তবে নিলে কে ? বাড়ীর ভিতর কিন্তু বাইরের লোক আসছে না। দিন দিন যা হ'য়ে দাঁড়াল—এ বাড়িতে টেকা দায় হ'বে ! যাও তোমরা খেলোগে বাছা"—

বাগানে গিয়ে দুই ভাইবোনে এই চুরির কথা ভাবতে লাগল। গোলাপ গাছে জল দিয়ে, শিউলি ফুল কুড়িয়ে

—খোকন-রাণু ফোয়ারার ধারে চাতালে বসে' মালা গাঁথতে লাগল।

রাণু বল্‌লে—"ভাই খোকন্, টাকাদুটো যায় কোথা? পিসীমা ত' আমাদের সাম্‌নেই আল্‌মারী থেকে বার করে টেবিলের কোণাটার রাখ্‌লে—তারপর ছোট্ট এসে কাঁদা-কাটা করছিল বলে তাড়াতাড়ি পিসীমা নিচে নেমে গেলেন!"

খোকন বল্‌লে"এ বিধু, না হয় ভজুয়ার কাজ বোধ হয়!"

রাণু বল্‌লে—"দূর্ পাগলা, বিধু খুব পুরোনো ঝি। কতবার কত জিনিষ হারিয়েছে—বিধু খুঁজে দিয়েছে। আর ভজুয়ার কথা মনে নেই? সেই যে রে—বাবা দর্‌জীকে দেবার তরে ভজুয়াকে একটা দশটাকার নোট দিলেন। ভজুয়া খানিক পরে খুচ্‌রো টাকা আর একটা দশটাকার নোট ফেরৎ আন্‌লে। বল্‌লে—'দুটো নোট্ একসাথে ভাঁজকরা ছিল। মনে নেই তোর?"

—হাঁ হাঁ সেই যে বাবা আবার ভজুয়াকে একটা গরম কোট বখ্‌শিস্ কর্‌লেন।

রাণু বল্‌লে—"তবে?"

দুপুর বেলা গুরু মশাই এলেন। খোকন-রাণু পড়্‌তে গেল বাইরের ঘরে। পড়াশুনা কর্‌তে কর্‌তে দু'জনেই ভাব্‌ছে চুরির কথা—এ কেমন করে হল—একবাড়ী লোক গিজ্ গিজ্ করছে—চোর এলো কোথা দিয়ে?

তিন্‌টে বাজ্‌তেই গুরু মশাই উঠ্‌লেন। বাড়ী ঢুকতেই মা বল্‌লেন—"খোকন-রাণু—আমার চাবির থোলো?"

রাণু বল্‌লে—"বাঃ আমরা রইলুম গুরু মশাইয়ের কাছে—কি করে জান্‌লাম?"

খোকন বল্‌লে—"এ সেই চোরের কাজ !"

পিসীমা—মা, একসাথে বলে উঠ্‌লেন—"কে রে ? কোন্ চোর বল্‌না ?"

খোকন তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি তুলে' বল্‌লে "তার আমি জানি কি ?"

রাণু খিল্-খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল—বল্‌লে "তবে এ বাড়ীকে ভূতে পেয়েছে !"

পিসীমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন "দূর্ টিপ্‌সী !"

রাণু বল্‌লে "বাঃ গুরু মশাই কাল ত' বল্‌ছিলেন একটা বাড়ীর কথা—সেখানে জিনিসপত্র কে তছ্ নছ করে' রাখ্‌ত—কারা চলা-ফেরা কর্‌ত অথচ কাউকে দেখা যেত না "

মা বল্‌লেন—"থাম্ রাণু, ফাজ্‌লামি করিস্‌নে।"

খোকন বল্‌লে—"ভূতটার কিন্তু দিদি মাথা আছে—না ? ভূতে ঝরণা কলম নিয়ে কি কর্‌বে রে ?—হিঃ হিঃ।"

বিকেলবেলা খরগোস্‌কে খাবার দিতে গিয়ে রাণু খোকনকে বল্‌লে—খোকন ভাই, আমরা যদি চোরটাকে ধর্‌তে পারি বেশ মজা হয়—না ?

খোকন বল্‌লে—"সেই ডিটেক্‌টিভের মত ?"

রাণু—"হাঁরে সেই যে পিসীমা পড়েন—সেই বইয়ে আছে—কেমন ফিকির করে ডিটেক্‌টিভ্‌রা চোর ধরে। আমরাও ধরব।"

খোকন বল্‌লে—"দিন কত আড়ালে আড়ালে থাক্‌লেই ধরা পড়্‌বে।"

রাণু বল্‌লে—"তবে এর মধ্যে মজা আছে। বাবার ঝরণা কলম নিলে অথচ তার পাশেই সোনার হাত ঘড়ি ছিল, সেটা ত' নেয় নি !"

খোকন বল্‌লে—"হয়ত' তাড়াতাড়িতে দেখ্‌তে পায়নি।

রাণু বল্‌লে—"তাই যদি হবে, তবে চাবির গোছা নিলে কেন? ওর দাম কি?"

খোকন বল্‌লে—"তোর যেমন মাথা? চাবির গোছা নিয়েছে—এবার একদিন দেরাজ, আল্‌মারি খালি করে রেখে যাবে।"

রাণু বল্‌লে—"তবে ভাই আজ রাতেই আমরা সাবধান থাক্‌ব—আজ চোরটাকে ঠিক পাক্‌ড়াও কর্‌ব।"

খোকন বল্‌লে—"হাঁ 'এয়ারগান্‌টা'ও সাফ করে রাখ্‌তে হ'বে।"

ঝি খোকন-রাণুকে বল্‌লে—"হাঁ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিটির ভিটির করো, ওদিকে বড়বাবু মোটরে করে কোথায় বেড়াতে চল্‌লেন! শিগ্‌গীর যাও তোমাদের ডাক্‌ছেন।"

খোকন-রাণু দৌড়ুল উপরে।...

ওপরে যেতেই মা বল্‌লেন—"যাও, মাঝের ঘরে দেরাজের ওপর তোমাদের কাপড়-জামা রেখে এসেছি—শিগ্‌গীর করে পরে নাওগে।"

ঘরে ঢুকেই ওরা দেখলে দেরাজের পাশে বসে ছোট্ট কি কর্‌ছে! ওরা গিয়ে দেখ্‌লে ছোট্টর হাতে মায়ের সেই হারানো চুড়ি!

রাণু বল্‌লে—"ছোট্ট ভাইটি কি করছ?"

ছোট্ট চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি চুড়িটা দেরাজের একটা ফুটো দিয়ে গলিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—"এইতা আমাল্‌ তিতির বাক্‌ত!" (চিঠির বাক্‌স)

খোকন বল্‌লে—"ওতে কি আছে রে ছোট্ট?"

ছোট্ট আমোদে ডগমগ হ'য়ে বলে উঠ্‌ল—"তুলি আতে, কত কি আতে !"

রাণু ছোট্টকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে বল্‌লে—"চাবি আছে ? তোমার চিঠির বাকসে ?"

ছোট্ট বললে—"তাবি আতে !"

খোকন ছুটল মায়ের কাছে—"মা দেখবে এসো—দিদি চোর ধরেছে।"

মা কেঁপে উঠ্‌লেন—"ও বাবা, আমার গা কাঁপ্‌ছে গো—কি গেরো—দরোয়ানকে ডাক শিগ্‌গীর—ওগো দেখো না।"

বাবা একপায়ে মোজা পর্‌তে পর্‌তে বললেন "কৈ কোথায় রে ?"···বলেই মোটা লাঠিটা তুলে নিয়ে খোকনের পিছু পিছু দৌড়্‌লেন।

পেছনে পেছনে পিসীমা, বিধু ঝি, ভজুয়া, মা সবাই একে একে মাঝের ঘরে জড়ো হ'লেন চোর দেখ্‌বার জন্যে। সবাইয়ের হাতেই কিছু না কিছু হাতিয়ার।

সবাই দেখ্‌লেন ছোট্টর সাম্‌নে মেঝেতে হারাণো জিনিযের পাহাড়। বাবা হাঁকলেন "চোর কৈ ? পালিয়েছে ত' ?"

রাণু ছোট্টকে দেখিয়ে বললে "ঐ ত' বসে আছে চোর··· লাগাও মাথায় লাঠি, ঘীলুটা বেরিয়ে যাক।"

সবাই হো-হোঃ করে' হেসে' উঠ্‌লেন। পিসীমা-ও।

ছোট্ট মায়ের দিকে চেয়ে বললে "ভাল না চিতির বাকত তা ?"

"ও পাজি ছেলে—পুঁচকে চোর হ'য়ে উঠেছ তুমি ?"

পিসীমা বললেন "ঐ আমার টাকা দুটো !"

বাবা বললেন "ঐ আমার ঝরণা কলম।"

মা বললেন "দেখ্‌ছ, চাবি, চুড়ি, সেফ্‌টিপিন সব রয়েছে।"

পিসীমা বললেন "ওঃ কি হ্যাঙাম না বাধিয়েছিল পাজিটা!"

ভজুয়া বললে "হাম লোক-কো বহুৎ তঁখলিফ্‌ দিয়া, খোঁকাবাবু!"

এম্‌নি করে' রহস্যজনক চুরির কিনারা হয়ে গেল। বাড়ীর সবাই খুসী হ'ল। বেড়ানোর আমোদ সেদিন জম্‌ল ভালো।

কিন্তু……আমি জানি খোকন খুসী হয় নি। তা'র 'এয়ারগান'টা সাফ করা মিছেই হ'ল! কোথায় চোর ধরে' তার কপালে টিপ্‌ করে দুড়ুম করে মারবে, না চোর হ'ল কিনা তারই পুঁচকে ভাই ছোট্ট। এতে কার না মন খারাপ হয়? তোমরাই না হয় এর বিচার করো।

-- ✻ —

ভুলুবাবুর গল্প

আমার নাম শ্রীভোলানাথ সরকার। কিন্তু এখন আমার বয়স কম বলে সকলেই আমাকে অগ্রাহ্য করে কিনা, তাই সবাই বলে 'ভুলু'। যখন কোন ফাই ফরমাস খাটাবার দরকার হয়, তখন ডাকে 'ভুলুবাবু'। ডাক শুনলেই বুঝি, গরজের ডাক।...

বড় একদিন হবই, চিরদিন কিন্তু ছোট থাক্‌বোনা—তখন দেখা যাবে কে 'ভুলু' বলে! ভোলানাথ, সরকার বাবু, সরকার মশাই, সরকার সাহেব—এই সব বলে না ডাকলে কোন কথা শুনবই না। এ্যায় সা দিন নাহি রহেগা; হুঁ হুঁ!

আমার ভাইয়ের নাম 'লাল্‌'। দিদির নাম 'ডলু'। কাকার নাম 'গুলু'। এই কাকাই আমার জীবনের পরীর অভিশাপ —ডাইনীর মায়া। হয়ত রাজপুত্তুর ছিলাম—পরীর বনে এসে পরীরাণীর ঘুম ভাঙিয়ে ছিলাম কিংবা কোন ডাইনী হয়ত দোরে ভিক্ষে করতে এসেছিল "যাও, যাও, হবে না, হবে না" বলে দোর বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাই শাস্তির ব্যবস্থা এই 'কাকাবাবু'। আমি যেন গরুর গাড়ীর গরু, আর কাকা ছিপটি হাতে গাড়োয়ান। কে জানে বাবা! এই কাকাটি যা গাঁট্টায়, যা চাঁটায়, যা ধমকায় তা আর কী বলব! অবশ্য বাড়ীশুদ্ধ সকলের গালাগালি ঢালবার পাঁশগাদা আমি, কিন্তু বিশেষ করে' এই কাকাটির।

কাকা, একদিন কি-জানি-কেন, আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে একটা গল্প বলেছিল। অবশ্য নিজে বানিয়ে বলেনি, একটা ইংরেজী বই দেখে বাংলা করে বলেছিল; তাও আবার মাঝে মাঝে বেধে যাচ্ছিল 'দাঁড়া, পড়ে নি" বলে থেমে থেমে বলছিল। গল্পটা অবশ্য খুব ভালো, শুনতেও বেশ ভালো লাগছিল, এরিয়েল, ক্যালিবান—ব্যান্ ব্যান ক্যা ক্যা ক্যালিবান্ …সব মজার মজার পরী আর জানোয়ারের কথা…যাদুকরের খেলা…খালাসিদের মাতলামি, যাদুকর প্রস্পারোর যাদু…

কাকা চলে যেতেই সেট বইটা বার করে কাকারই কলম দিয়ে সেই বইয়ে দুটো—মাত্র দুটো—গোণা দুটো ছবি এঁকেছিলাম—একটা ডানাওয়ালা এরিয়েলের ছবি, আরেকটা ভূতভুতে ক্যালিবানের ছবি। বইয়ে ছবি দেয় না কেন, মোটা মোটা বই তাতে ছবি নেই। কি যে বইয়ের ছ্যারি। তা আমি ছবি এঁকেই না হয় দিয়েছি। ক্যালিবানের ছবিটা আঁকতুম না, কিন্তু এক ধ্যাবড়া কালি পড়ে যাওয়ায় তবেই না সেই থেকে হাত পা বার করে, ক্যালিবানের ছবি আঁকা! তা ছবি দুটো মন্দ হয়নি। কিন্তু কাকা ছবি দুটো ভাল আঁকা হয়েছে, কি মন্দ আঁকা হয়েছে সে সম্বন্ধে রাম গঙ্গা কিছু না বলে স্বচ্ছন্দে ফুটরুল দিয়ে, আমারই ফুটরুল দিয়ে, লাগিয়ে দিলে চ্যাটাং-চ্যাটাং করে ঘা চার পাঁচ। কেন ভুলুশর্ম্মা বুঝি ছবি আঁকতে জানে না—কি-বা এমন খারাপ এঁকেছিলাম! নেই ছবির চেয়ে খারাপ ছবি ভাল নয় বুঝি! আবার পাছে ছবি আঁকি তাই ড্রয়ারে কলমটা চাবিবন্ধ করে রেখে দিলে।

তা বড় বয়েই গেল। না দিলে নেই নেই! আপাততঃ পেন্সিলেই ছবি আঁক্‌ব।

কিন্তু খাতা ? ঐ তো হিসেবের খাতা—ওতে সব হিজিবিজি লেখা, ছবি নেই। থাক্‌বে কোথা থেকে ? কেউ কি ছবি আঁকতে পারে ?

তবু আমাকে লিখতে দেয় না।······ও কতো হিসেব। গয়লা, মুদি, ঝি, চাকর—এদের ছবি আঁকলে কেমন হয় ? ছবি দরকার, খুব দরকার। নয়ত মুস্কিল হ'তে পারে। এসব কে ভাবছে ? ভজুয়া আমাদের বাড়ীতে কাজ করে—যদি মাস কাবারে মোড়ের লাল বাড়ীর চাকর রামধনিয়া এসে বলে —আমার নাম ভজুয়া, তলব দিন বাবু ? যদি ধরো বাড়ী ছেড়ে পালায় কোনদিন ? ছবি এঁকে রাখা ভালো।

গয়লা হরিচরণ আমাদের দুধ দেয়, কিন্তু আগেকার গয়লা শিউচরণ যদি হঠাৎ একদিন ঠং ঠ-ঠ-ঠং করে খালি দুধের ড্রামটা রকে রেখে গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলে, "মাজী দাম ?"

তখন যে কি বিশ্রী ঝঞ্ঝাট, হ্যাঙ্গাম, হৈচৈ, কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধবে। তা কি কেউ ভাবছে ? তার চেয়ে ওদের ছবি আঁকা থাকলেই ভালো। কোনো ভুল হবার যো নেই।

হরিচরণের ছবি আঁকা যাক এই পাতায়—হ্যাঁ, ওব মাথায় খোঁচা চুল, গায়ে ফতুয়া—ব্যস্। তলায় লেখা থাক্ —"হরিচরণ গয়লা।" এবার টিকিদাস ভজুয়ার ছাঁদ—গায়ে গেঞ্জি, কাঁধে গামছা, মাথায় টিকি—হয়েছে। তলায় লেখা থাক্ "ভজুয়া চাকর।"

ঐরে—কে আসছে। খাতা বন্ধ। আমি সট্‌কান দেই।···

ও বাবাঃ! খাতা খুলছে যে ছোট কাকা! সেরেছে!

"ভুলু, ভুলু,—এই ভুলু! কাকা রেগে গিয়ে কি রকম ডাকছে। ওরে বাবা, গলার শির ফুলে উঠেছে যে! চোখ কেমন ঘুরছে!

কি করি অগত্যা আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলুম। ভাল মানুষির সুরে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী কাকা? ডাকছিলে?" হৃৎপিণ্ডটা কাটা কৈ মাছের মত গলার কাছে ধড়ফড় করছে!

খপ্ করে আমার হাতটা ধরে হিসেবের খাতা খুলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে কাকা, "এ-সব কীরে? কে করেছে এসব?" হঠাৎ যেন রাগটা থমথমিয়ে এসেছে।

কেন আমি! ভাল হয়নি ছবিগুলো?

কাকার মুখে হাসি খেলে গেল। বললে "বেশ হয়েছে।" একী রাগ করলে না ত' কাকা? ছবি দেখে বোধ হয় খুশী হয়েছে। মনে মনে ভারী খুশী হলাম—যাক্ এতদিনে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

কাকা মোলায়েম সুরে বললে, "হিসেবের খাতায় কি ছবি আঁকেরে বোকা?"

আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম, "ও ত হিসেবী ছবি—যাদের হিসেব থাকে খাতায় তাদেরই ছবি।"

"তোর কী বুদ্ধিরে! আচ্ছা, চ' আমার সঙ্গে। তোকে ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনে দেব!"

কাকা তখনি মোড়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা ছবি আঁকার খাতা আর এক বাক্স লাল-নীল রং পেন্সিল কিনে দিলে।

ফেরবার পথে আসতে আসতে বললে কাকা, "ভুলু আমি এবার পাশ করেছি রে!

ও তাই! বললাম, "তবে যে খাওয়ালে না? জলযোগের সন্দেশ?

কাকা বল্লে, "খাওয়াবো, আগে গেজেট হোক্।"

"গেজেট্‌ কি কাকা ?"

"গেজেট্‌ একটা বই। তাতে যারা পাশ করে তাদের নাম ছাপা হয়।"

আমি বললাম, আমার নামটাও তাতে বলে-কয়ে ছাপিয়ে দিও। আমিও ত ছবি আঁকায় পাশ করেছি—তারই ত এই পুরস্কার।
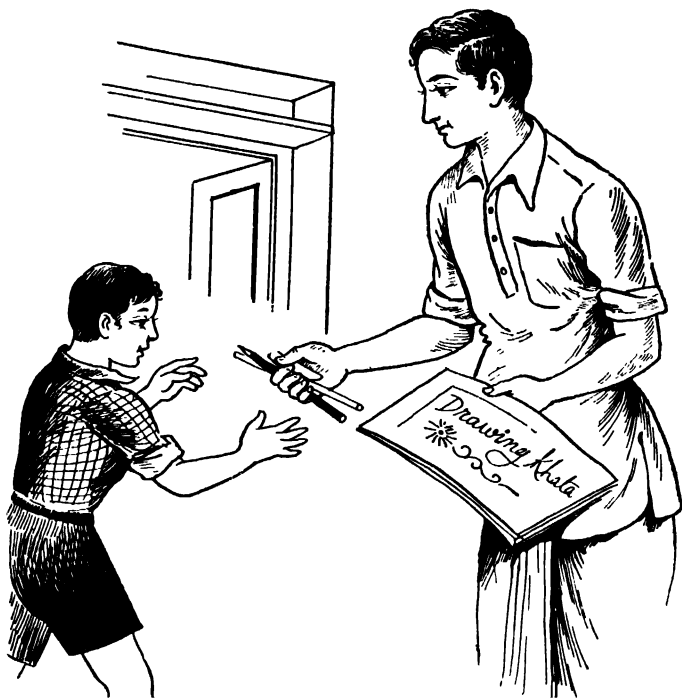
কাকা আমার গালটা আদর করে টিপে বললে, "দেবো ছাপিয়ে।"

কাকা তা'হলে 'ছিপটি হাতে গড়োয়ান নয়ত'—রং পেন্সিলও কিনে দেয়। বেচারি পাশ করুক, গেজেট্‌ হোক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমার মাথায় যত চুল তত নম্বর পাক্‌।

ক্ষ্যাপা খগেনের কাণ্ড

পাল চৌধুরী ইনৃষ্টিটিউটের বোর্ডিংসুদ্ধ ছেলে সেদিন একদম চম্‌কে থ' হয়ে গেল। চিঠি আসে রোজ একটি দু'টি—আদুরে নন্দদুলাল হৃষিকেশের দিদিমা'র চিঠি সপ্তাহে দুটো, পটল নাগের মামাবাবুর চিঠি আর ফটিকচাঁদের দিদির চিঠি, আমাদের ? ছোঃ! বোর্ডিং-এ আছি তা'তে বাড়ীর কারু বড় ভাবনা নাই! বরং বাড়ী থাকলেই ভাবনা। যা এক-একটি রত্ন আমরা। তা'তে দুঃখ নেই—মাসের শেষে মণিঅর্ডারটা এলেই নিশ্চিন্তি···তার কুপনে যে বাবা অমুকচন্দ্র আশাকরি ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা থাকে তা কি আর ভাই পড়ি। সে যাহোক সেদিন আমরা একদম হাঁ··· বিস্কুটের টিন ভর্তি হয়েছে···তা ছাড়া ঘুঁটের ঝুঁড়িটা ভর্তি চিঠি। সব এক ঐ খগেন্দ্রনাথ শিকদার বরাবরেষু···ব্যাপার কি ? ক্ষ্যাপাটা এত চিঠি পেলে কোথা ?

পট্‌লা বললে, "ক্ষ্যাপা এবার সত্যি ক্ষেপেছে রে।"

রমেশ বললে, "না, সুদে-আসলে বাড়ীর চিঠি এল!"

বোর্ডিং-এর চাকর নরহরি ঝুড়িসুদ্ধ চিঠি নিয়ে খগেনের ঘরের দিকে গেল। আমরাও ভিড় করে গেলাম।

খগেন কেমন যেন খুশি-খুশিভাবে দরজাটা খুলে বললে, "এখানে ঢেলে ফেল,···দশটার ডাকে আরো আসবে।"

আমি বললাম এত চিঠি কিসের র‍্যা ?

খগেন বললে, "আছে আছে রহস্য আছে"—ব'লে একটা··· ছুড়ি ড্রয়ার থেকে বার করলে।

রমেশ বলেলে, "তোর এত আত্মীর-স্বজনও ছিল ? অবাক কাণ্ড।"

খগেন বললে, "আত্মীয় কে বললে তোকে ?

সকলে উৎগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তবে ? ব্যাপার কি ?"

খ্যাঁদা বললে, "এই চিঠি খুলে পড়তে ত' তোর ছ'মাস যাবে। তা আমরা না হয় তোকে সাহায্য করব'খন।"

কথাটা লুফে নিয়ে খগেন বললে, "বেশত' তোদের সাহায্য দরকার হবে, তবে চিঠি পড়বার জন্য নয়।"...এই বলে সে একটা খামের মুখ ছুরি দিয়ে কেটে চিঠিটা বার করলে। তাতে একটা টিকিট মারা রয়েছে।

সকলে ঝুঁকে পড়লাম...দেখি দেখি কি লিখেছে !

খগেন সকলকে সরিয়ে দিয়ে বললে, "আমি পড়ছি শোন্"...

প্রিয় মহাশয়,

আপনার......পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানিলাম আপনার একটি কুকুর প্রয়োজন। ঠিক আপনার প্রয়োজনরূপ কুকুর আমার একটি আছে। আপনার উত্তরের জন্য টিকিট দিলাম। বিশেষ বিবরণ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি...

বিপিন উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে বললে, "খগেন সত্য সত্যই ক্ষেপল।"

আমি বল্‌লাম, "কি ব্যাপার খগেন—কুকুর কিনবে ? এত কুকুর ?"

খগেন রহস্যজনক ভাবে ড্রয়ার থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে বললে, "এই দেখ, কি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। চাই

খুব ভাল কুকুর, যে কোন জাতের হইলে চলিবে, বিশেষ বিবরণের জন্য ষ্ট্যাম্প সহ লিখুন।”...

খগেন্দ্রনাথ শিকদার

পাল চৌধুরী ইন্‌ষ্টিটিউট, বামুনকাটি, ২৪পরগণা।

রমেশ বিজ্ঞভাবে বললে, “আহা মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে বেচারীর।”

পটল বললে, “দূর, জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকট দেখতে পাচ্ছিস্ না?”

অনাদি বললে, “ওকি বিদ্‌ঘুটে শখরে! কুকুর নিয়ে তুই কি করবি?”

খগেন ক্ষ্যাপা বললে, “কুকুর নিয়ে আবার...কি করব? কুকুর আমার চাই না।”

চোখ বড় বড় করে অনাদি বললে, “কুকুর তোর চাইনা? তা'হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে গেলি কেন? উজবুক্ এইবার কি ক'রে মেরে দেখ।”

খগেন বেপরোয়াভাবে বললে, “চুলোয় যাক। এখন এই চিঠিগুলো খুলে টিকিটগুলো আলাদা কর দিকি বাপু, কাজ কর ...দিক করিস্ না...সময় হলে সব জানতে পারবি।”

সকলে মিলে ধাঁ-ধাঁ করে টিকিটগুলো আলাদা করতে লেগে গেলুম। সব খোলা হয়ে গেলে খগেন একটা পেন্‌সিল নিয়ে লিখতে বসল।

মহাশয় বা মহাশয়া,

দয়া করিয়া আগামী ২১শে মে বেলা দু'টার সময় আপনার কুকুর লইয়া মনুমেণ্টের তলায় আসিবেন। ইতি

বসংবদ

খগেন্দ্রনাথ শিকদার।

অনাদি বললে, "এগুলো আবার কুকুরের মালিকদের পাঠাবি ?"

খগেন বললে, "ক্ষেপেছিস, কত খাম কিনতে হবে জানিস্ ? কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। কম খরচে হবে। টিকিটগুলো সব লাভ বুঝিসনি ?"

"তা ত' বুঝলাম। কিন্তু এ কি পাগলামি তোর ? বলছিস তোর কুকুর চাই না, আবার মনুমেণ্টের কাছে কুকুর নিয়ে আসতে বলছিস এদের ? এসব কি করছিস বলত ?"

খগেন বললে, "পাগলামির কথা কিছুমাত্র নেই এতে। শুধু দেখে যা, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ?

দুইদিন ধরে কেবল চিঠি আসতে লাগল। তারপর খগেনের বিজ্ঞাপন বেরুল।

আমরা অনেক চেষ্টা করে কৌশলে খুঁচিয়ে খবর বার করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু খগেনটা একেবারে বদ্ধ পাগল কিনা—কিছু বললে না। কি একটা ফন্দি করেছে কে জানে !

২১শে মে আমরা মনুমেণ্টের তলায় হাজির হলাম। সর্বনাশ। কুকুরে জায়গাটা ভর্তি হয়ে গেছে—আর তেমনি ভিড়। চেনে বেঁধে হরেক রকম লোক কুকুর নিয়ে এসেছে এবং প্রত্যেকে অন্য লোকের কুকুরের দিকে নাক কুচকে চাইছে,—গ্রেহাউণ্ড, পিকিনিজ, বুলডগ, ম্যাষ্টিক ফক্সটেরিয়ার, বুলটেরিয়ার, দেশী কুত্তা, বোতলমুখো, বকমুখো, বেরালমুখো, শাদাচোখো, খ্যাদা-নেকো, বেঁড়ে, লেজওয়ালা, লোমের পুঁটলি, ল্যাগবেগে, ঢ্যাঙঢেঙে, বেঁটে, হটহটে, ছটফটে, মেনীমুখো…কত কুকুর, দেখে তাক লেগে যায়।

খ্যাঁদা বললে, "সর্বনাশ ! ক্ষ্যাপা খগেন এদের ধাপ্পা

মারবে ভেবেছে।—এরা তাকে কি আস্ত রাখবে—কুকুর দিয়ে খাওয়াবে!”

পটল এদিক ওদিক উঁকি মারতে মারতে বললে, “কিন্তু হতভাগাটা গেল কোথা? দুটো বাজ্‌তে ত’ দশ মিনিট বাকি!”

রমেশ বললে, “পাগল হ’য়েছিস—খগ্‌না সট্‌কান দিয়েছে এতক্ষণে!”

এদিকে তখনো দলে দলে কুকুর আসছে, তাজ্জব ব্যাপার! ইতিমধ্যেই কয়েক দলে ঝগ্‌ড়া বেঁধে গেছে—কুকুরের ডাকে জায়গাটা গম্‌গম্‌ করছে। দর্শক্‌ও জমেছে বেশ।

অনাদি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “উই-উই যে।”

আমি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম, “চুপ!”

দেখলুম, খগেন একটা ঝুড়ি হাতে ঝুলিয়ে গম্ভীর ষ্টাইলে আসছে—কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ক্যামেরা।

সে ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ক্যামেরা ঠিক করে নিলে।

পটল বললে, “স্ন্যাপ্‌ নেবে নাকি?”

রমেশ বললে, “স্ন্যাপ্‌ও অবশ্য নিতে হ’বে—”আমরা হেসে উঠলুম। খগেন ক্যামেরাটা রেডি করে ঝুড়ির ঢাকনা খুলে দিলে। হঠাৎ কুকুরের খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌, ঘেউ ঘেউ, ভ্যাক্‌-ভ্যাক্‌, ভুক-ভুক শব্দে কাণে তালা লাগবার যোগাড় আর কি! সেই কুকুরের ভিড় যেন হঠাৎ চঞ্চল উদ্বেল সমুদ্রের মত উথ্‌লে উঠল—তাদের মধ্যে যেন একটা মহামারী কাণ্ড বেঁধে গেল। দেখতে পেলাম সেই ঝুড়ির মধ্যে থেকে ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর লাফালাফি করে ভিড়ের মধ্যে ছুটোছুটি সুরু করে দিলে। কুকুরদের সামলাবার জন্য কুকুরদের মালিকরা তাদের টানাটানি করে—ইঁদুর ধরবার জন্য কুকরগুলো ঝাঁপাঝাঁপি

করে আর কুকুরের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ইঁদুরগুলো তুর্কি নাচন নাচে—সে এক দেখবার দৃশ্য। হো-হো, হই-হই, ভ্যাক্‌ভ্যাক্, ভেউভেউ ধ্বনিতে মাঠ গম্‌গম্ করতে লাগল। মনুমেণ্টের ভিত কেঁপে উঠল। খগেন কিন্তু ধীরে ধীরে কয়েকটা স্ন্যাপ তুলে নিলে। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যামেরা-ম্যান ধীরভাবে কাজ করে যায়, গুলি-গোলার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না—খগেনও ঠিক সেইভাবে কাজ সেরে ক্যামেরা বন্ধ করে খালি ঝুড়িটা হাতে নিয়ে বাস-স্টাণ্ডের দিকে দৌড়ল।

আমরা বললুম, ক্ষ্যাপাটার কাণ্ড দেখলি! "ক্ষ্যাপা খগেন ত' ক্ষ্যাপা খগেন—আচ্ছা এই লোকগুলো ক্ষেপে গিয়ে যদি স্কুলের বোর্ডিং-এ চড়াও হয়?"

আমরা নানা জল্পনা-কল্পনা করতে করতে বোর্ডিং-এ ফিরলাম। কোন দিকে কোন আলো দেখতে পেলুম না।

পটল বললে, "হয় খগেন একদম ক্ষেপে গেছে, না হয় এর মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে—"

ভোঁদা বললে, "আর না হয় আমরাই ক্ষেপে গেছি—"

"ভোঁদাটা অমনি যাতা বলে,—আমরা ক্ষেপতে যাব কেন?"

রমেশ বললে, "তুই ক্ষেপ্‌গে যা ভোঁদা—আমাদের নিয়ে —টানাটানি করছিস কেন?"

ভোঁদা তেমনি আনাড়ির মত বলে, "সে কেন, আর সবাই মিলে ক্ষেপে যাই—"বলে কি হাসি তার!

খগেনকে আমরা পাকড়ে ধরলাম, "বল্ এ সবের মানে কি?"

কিন্তু খগেন চোখ মিট্‌মিট্ করে বললে, "ধীরে বন্ধু ধীরে—সবুরে মেওয়া ফলে—"

রমেশ বললে, "সবুর করবার জন্যে ব'য়ে গেছে—আমি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবো—"বলে সে খগেনকে জাপ্‌টে ধরল—

তারপর সবে তার হাত মুচড়ে ধরেছে অমনি স্যুপারের আবির্ভাব।

"কি হচ্ছে তোমাদের? এত লাফালাফি করছ কেন? নিচে যে টেঁকা দায়।"

রমেশ আমতা আমতা করতে লাগল, "এই, এই গিয়ে আপনার খগেনকে জুজুৎসুর একটা প্যাঁচ শেখাচ্ছিলুম স্যার"—

স্যুপার বললেন, "যে যার ঘরে যাও, খগেনকে পড়তে দাও—আর রমেশ আর পটল চলো আমার ঘরে,—পঞ্চাশপাতা সংস্কৃত ট্রান্‌স্লেসন ক'রে তবে তোমাদের ছুটি"—

পটল বললে, "আমি স্যার কি করলাম?"

স্যুপার বললেন, "তুমি খগেনের কান খুঁটে দিচ্ছিলে না? বদ্‌মাস্ ছেলে সব।"

* * * *

শনিবার সকাল। খগেনের হাতে একটা লম্বা খাম—মুখে এক গাল হাসি।—"এই এদিকে আয়। তোদের রহস্য আজ পরিষ্কার করে দিই—"ব'লে খাম থেকে একটা চিঠি বার করলে। উপরে লেখা অ্যামেচার ফটোগ্রাফী—আস্‌ছে কোডাক্ কোম্পানী থেকে,—চিঠির মর্ম্ম এই যে, কুকুর সম্বন্ধে ফটো পাঠাবার জন্য তাঁদের যে প্রতিযোগিতা হয়, তাতে—মিষ্টার খগেন্দ্রনাথ শিকদারের প্রেরিত কুকুরের ছবিটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তাকে প্রথম প্রাইজ ৭৫৲ টাকা ডাক যোগে পাঠান হ'ল।

সকলে উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, "হুররে! কে বলে খগেন ক্ষ্যাপা।" ও এই জন্যেই তোর এত তোড়জোড়—ও বাবা তোর মাথাখানা ত' বড় যা-তা নয়!"

রমেশ বললে, "কিন্তু খাওয়াতে হবে ভাই টাকা এলে।"

খগেন বললে, "নিশ্চয় নিশ্চয়—এই জন্যেই ত' বলেছিলুম সবুরে মেওয়া ফলে।"

—০—

ছিচ্‌কাঁদুনের গল্প

এক-একটা ছেলেমেয়ে থাকে তারা এমন কাঁদুনে আর বায়নাদার যে তাদের নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সক্কলে নাটা ঝাম্‌টা খেয়ে যায়—কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। এমনি মেয়ে ছিল আমাদের বাড়ীর চুম্‌কি। রোগা রোগা মুখখানা—ফর্সা ধব্‌ধবে—সুন্দর পদ্মফুলের মত মুখশ্রী, জ্বল্‌জ্বলে নীল্‌চে চোখ, রক্ত প্রবালের মত টুকটুকে ঠোঁট।

যে দেখে সেই তাকে আদর করে কোলে তুলে নিতে যায়। কিন্তু এমন সুন্দর চুম্‌কির ছিল ভারী বিশ্রী স্বভাব। একটু কিছু ত্রুটী হ'লেই হঠাৎ এমন কান্না ধরত' যে কার সাধ্য তাকে থামায়! তার উপর বায়না—আর সে সব কি সৃষ্টিছাড়া বায়না তা কি বল্‌বো!

রাত দুপুরে বলে—রাস্তায় চাপাকলে চান করবো—হেদোর ধারে গাছের ডালে উঠে পাতা ছিড়্‌বো—ময়ূর কিনে দাও—তার লেজ ধরে টান্‌ব। এমনি আরো কত কি!

বাড়ী শুদ্ধ সক্কলে তাকে নিয়ে অস্থির—নাজেহাল। একদিন সকালে খুব বর্ষা নামল। কাজেই চুম্‌কির আর বেড়াতে যাওয়া হ'লনা। অমনি তার মুখটি ভার—চোখে এল জলের ফোয়ারা। সে জানালার ধারে বসে প্যান্ প্যানাতে সুরু করলে। ছোট কাকা লাল একটা বল এনে দিলে—চুম্‌কি সেটা দূর করে ধূলোয় ফেলে দিলে। তার দাদা অমল তাকে একটা ছবির বই দিতে গেল; সে রাগ করে দিল তার পাতা ছিঁড়ে—দাসী দুধ খাওয়াতে এল—তার চুলের মুঠি ধরে টেনে বাটী উল্টে দিলে।

পাশের বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা জানালার ধারে বসে বসে ছড়া কাট্‌ছে—

—"আয় বৃষ্টি ঝেপে
ধান দেব মেপে"
—"আয় বৃষ্টি টাপুর টুপুর
পায়ে দেব বেঁধে নূপুর"
—"বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ ঝমা ঝম্‌
মেঘ মুলুকে দম্‌ দমা দম্‌
গুড়্‌ গুড় গুড়্‌ বাজছে ঢাক
আয় বৃষ্টি একশো লাখ।"

কী তাদের আনন্দ। কী তাদের স্ফূর্ত্তি। ভাই বোন সব এক ঘরে বসে কল্‌কল্‌ কাকলীতে বাড়ী মাতিয়ে তুল্‌ছে।

আর আমাদের চুম্‌কি শুধু বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ নষ্ট হ'য়েছে বলে মুখ ব্যাজার করে পা ছুড়ছে আর কাঁদছে—"বিচ্ছিরি বৃষ্টি! দুষ্টু বৃষ্টি! দূর হ—দূর হ—তোদের জ্বালায় বেড়াতে যেতে পারছি না—খেলা করতে যেতে পারছি না।"

জানালার ধারে মুক্তোর টল্‌টলে ফলগুলোর মত বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে—হীরার কুচির মত বৃষ্টি—রূপোর ঝরণা যেন!

কিন্তু চুম্‌কির মন্‌ গেছে খিঁচরে—মেজাজ হয়ে গেছে বিচ্ছিরি—তাই তার কিছুই ভাল লাগছে না।

সামান্য একটা কাজে বাঁধা পেয়ে সুন্দর চুম্‌কি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে—জামায় ভিজে চোখ মুছে মুছে তার জামা হয়েছে নোংরা। যে অনবরতই কাঁদছে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যতই কাঁদে ততই তার আরো দুঃখ হয়। যতই দুঃখ ততই সে ফ্যাস্‌ ফ্যাস করে কাঁদে—কিছুতেই কান্না থামে না।

হঠাৎ এক সময় চুম্‌কি আপনার মনেই বলে উঠল, "একী। আমি যে কিছুতেই থামতে পারছি না—কেবলই যে কান্না আসছে।"

তার খুব কাছ থেকেই ছিঁচকাঁদুনে গলায় কে যেন বলে উঠল, "ঠিক আমারই দশা! আমিও আজ বিয়াল্লিশ দিন ধরে কেবল কাঁদছি।" এই বলে সে আরো ডুক্‌রে কেঁদে উঠল, "ও মাগো, আমার কি হবে গো—য়ঁ্যা-য়ঁ্যা ওঁয়া-ওঁয়া।"

চুম্‌কী চম্‌কে উঠে দেখে—রোগা মত একটা ছেলে তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তাঁর পেটটা জয় ঢাকের মত, শরীর রোগা প্যাকাটির মত। হাতগুলো ঝাঁটার কাঠির মত, ঠ্যাংগুলো বকের ঠ্যাংয়ের মত, চোখ দুটো জুল্‌জুলে—জলে আর পিঁচুটিতে ভরা। জামার হাত দুটো বার বার ভিজে চোখ মুছে মুছে নোংরা বিচ্ছিরি।

চুম্‌কি অবাক হয়ে ছেলেটাকে দেখতে লাগল। তার এক ঘেয়ে ঘ্যান্‌-ঘ্যানানি যেন মোটেই থামে না। চুমকি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা খোকা, তুমি কি হাসতে জান না মোটে?"

চুম্‌কির কথা শুনে ছেলেটা ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললে—য়ঁ্যা-য়ঁ্যা আমাকে খোকা বলেছে—য়ঁ্যা-য়ঁ্যা আমার নাম শ্রীমান ছিঁচকাঁদুনে রায়—পিতার নাম শ্রীযুক্তবাবু খুন্‌কাঁদুনে রায়।

চুম্‌কী বল্লে, "দ্যুৎ। খুন্‌কাঁদুনে বুঝি কারো নাম হয়?"

ছিঁচকাঁদুনে বল্লে, "ডাকবো বাবাকে? দেখবে তখন ঠেলা। একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে বাবা যেন খুন হয়ে যায়! আমার পিসিমা তাই বাবার নাম রেখেছে খুন কাঁদুনে—"

চুম্‌কি বল্লে, "তোমরা কোথায় থাকো?"

ছিঁচকাঁদুনে বল্লে, "কান্নাকাটির মুল্লুকে।"

সে আবার কোন্ দেশ ? চুম্‌কি জিজ্ঞাসা কর্‌লে।

"যে দেশে কেউ হাসে না, তোমাদের দেশে যারা খুব কাঁদে তাদের আমরা আমাদের দেশে নিয়ে যাই।"

"সেখানে গেলে কি করতে হয় ?"

"কেবল কাঁদতে হয়। যত ইচ্ছে কাঁদ—বায়না কর—হিংসুটেপনা কর, কেউ কিছু বলে না। সেখানের স্কুলে বায়না ধরা শেখায়—নানা রকম কান্না শেখায়—মড়া-কান্না, মায়াকান্না, বায়না ধরা কান্না, স্কুলে না যাবার কান্না, লজেন্স খাবার কান্না, খেলনা-কিনে দেবার কান্না—হরেক রকম কান্না—ঠ্যাং ছড়িয়ে কান্না—আছাড় পাছাড় খেয়ে কান্না, ডুক্‌রে কান্না—এই সব আমি শিখে ফেলেছি।"

চুম্‌কি অবাক হ'য়ে গালে হাত দিয়ে বললে, "ওমা সে আবার কেমন স্কুল।" ছিচ্‌ কাদুঁনে বল্লে 'খুব ভাল স্কুল।' ছেলেরা যাতে হাসিখুশী ভুলে রাতদিন কান্নাকাটি করে তার ব্যবস্থা হয় স্কুলে, আমাদের একখানা বই পড়তে হয় তার নাম "কান্নাকাটি"—সে বই পড়লে অ আ শেখা যায়—সে বই পড়া সুরু হ'লে ছেলেমেয়েরা ডুক্‌রে কেঁদে উঠে এমন সুন্দর লেখার কায়দা। শুন্‌বে খানিক—আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে—

"ক-য় ককিয়ে কাঁদে খোকাখুকু
খ-য় খিম্‌চি দিলে বড্ড দুখু
গ-য় গগণ ফাটে গলার রবে
ঘ-র ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ধর সবে—"

চুম্‌কি বলে উঠল, "ওয়াক থুঃ! ওই আবার ভাল বই! বিচ্ছিরি—বিচ্ছিরি বিটকেল্—আচ্ছা তোমরা কি কেউ হাসতে জানো না ?"

ছিঁচ্ কাঁদুনে শিউরে উঠল, "উঃ রে বাবা! হাসি? বলো কি? হাসির কি আছে—যেদিকেই চোখ পড়ে, তাই দেখেই আমার চোখ ছল্‌ছলিয়ে আসে—তুমি হাসতে পারো?"

চুম্‌কি বল্লে, "নিশ্চয়ই! এখন কাঁদছি বলে কি আমি অষ্টপ্রহর কাঁদি নাকি?" কিন্তু চুম্‌কি অনেক চেষ্টা করেও হাস্‌তে পারল না। তার ভীষণ ভয় ধরে গেল।

সে আশ্চর্য হ'য়ে বলে উঠ্‌ল, "কী সর্ব্বোনাশ—! আমি ত' হাসতে পারছি না!" বলার সঙ্গে সঙ্গেই চুম্‌কি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে।—

ছিঁচ কাঁদুনে বলে উঠ্‌লো, "তা হ'লে তুমি ঠিক আমার সেই হারিয়ে যাওয়া বোন্—তার নাম ছিল খুন্‌সুটি—রাতদিন খুন্‌সুটি করতো কিনা—তারপরই কান্না! তাই সকলে তাকে খুব ভালবাস্‌তো—তোমার কান্না শুনে আমি ভাবলাম বুঝি খুনখুটিই আমাদের!"

চুম্‌কির বেজায় বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল। সে বলে উঠ্‌লো, না না, আমি তোমার বোন্ খুন্‌সুটি হ'তে যাবো কোন্ দুঃখে? আমার নাম চুম্‌কি, আমার দাদার নাম অমলকুমার—দাদা খুব ভাল ফুটবল খেলতে পারে—।"

ছিঁচ্‌কাঁদুনে তখন কান্না জুড়ে দিল, "কেউ আমার বোন্ হ'তে চায় না য়্যা য়্যা—কেউ ভাল বাসে না—"

চুম্‌কি তাকে ভোলাবার জন্যে বল্লে, "আচ্ছা ছিঁচ কাঁদুনে তুমি গান গাইতে পারো?"

ছিঁচকাঁদুনে বল্লে, "পারি বৈ কি! আমাদের স্কুলে গানের ক্লাশ হয়। সেখানে কত রকম গান শেখায়। শুন্‌বে একটা, এই বলে সে গান ধরলো—

"সকালে উঠিয়া আমি কেঁদে হই সারা
বাড়ী শুদ্ধ সরগরম। তেতে ওঠে পাড়া।
তারপর নাইতে খেতে কান্না চলে জোর
রেগে গেলে কাঁদি আরো ভেঙ্গে ফেলি দোর—

আর একটা শুন্‌বে ? এটা আরো ভাল—

আমি ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলে
ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বসি
সবাই যখন খেলে
দেখলে হাসি লোকের মুখে
জ্বলে আমার পিত্তি
কথায় কথায় কান্না ধরি—
মেজাজ খারাপ নিত্যি।

বেশ না গানটা। আরেকটা শোনো—এটা শুনে মেশোমশাই আমাকে ছাতার বাড়ি মেরেছিল। তাই এটা ভয়ে ভয়ে গাই। এই বলে সে হঠাৎ রাক্ষুসে বাজখাঁই গলায় গেয়ে উঠ্‌ল—

"আমি কাঁদতে পারি এমন কাঁদন
উঠ্‌বে সবাই চম্‌কে
যেমন কেল্লা থেকে একশো কামান
উঠ্‌ল হঠাৎ ধম্‌কে—
ভয়ে সবাই মূর্চ্ছা যায়
আমি কাঁদতে পারি এমন কাঁদন
হঠাৎ যদি সুর পাই।"

চুম্‌কির কান্না থেমে গেছে। সে অবাক হ'য়ে ছিঁচ্‌কাঁদুনের রকম সকম দেখছে।

ছিঁচ্‌কাঁদুনে খানিক থেমে আবার গলা পরিষ্কার করে বল্লে, "ফের শোনো—এটা হচ্ছে দাদ্‌রা তাল, খুব তাড়াতাড়ি গাইতে হয়—এম্‌নি করে—

হিংসে বিষে মন ঠাশা মোর—
হাস্‌তে গেছি ভুলে
কথায় কথায় কান্না ঝরে
চোখের কুলে কুলে
বায়না আমার নিত্য সাথী
আবদারে মন ঠাশা
পিসি বলে বাস্‌ কি ছেলে
এক্কেবারে খাশা !
রাগের ঝোঁকে খিমঁচি কাটি
ছিঁড়ি মাথার চুল
ভুঁয়েয় বসে কেঁদে কেঁদে
ছিড়েছি পেণ্টুল।
বায়না জানি একশো রকম
হাজার রকম ডাক
চিল চেঁচানো থেকে সুরু
ঘোড়ার মত হাক।
আমি, কেঁদে কেঁদে নাম কিনেছি
ছিঁচ্‌কাঁদুনে রায়
বাড়ীর সবাই নোয়ায় মাথা
নোয়ায় আমার পায়।"

গান শেষ করে ছিঁচ্‌কাঁদুনে চুমকিকে বল্লে "তোমাকেও একটা গাইতে হবে।"

চুম্‌কি বল্লে, "আমি ভাল গান গাইতে পারি না। তার উপর সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙ্গে গেছে।"

ছিঁচ্‌কাঁদুনে নাছোড়বান্দা। বললে, "আরে, কাঁদুনে গলায় যা' গান ভাল হয়। যা জানো গাও—"

অগত্যা চুম্‌কি চোখ টোখ মুছে' গলা পরিষ্কার করে গাইলে—

"আমি, কান্নাকাটির ধাব ধারি না
হাসিখুসী ভাল বাসি—"

ছিঁচ্‌কাঁদুনে ভীষণ আপত্তি জানিয়ে তেড়ে এল—
"ওকি, ওকি ? থামো থামো—"

কিন্তু চুম্‌কি তখন দু'তিন লাইন গেয়ে ফেলেছে। সে আপন মনেই গেয়ে চলেছে—যতই গাইছে ততই তার মেজাজ ভাল হয়ে যাচ্ছে, মনে স্ফূর্তি আস্‌ছে—

"আকাশ বাতাস ঝল্‌মলানো
সূয্যি মামার রাঙা হাসি
গোম্‌ড়া মুখো মেঘের বুড়ো
হাসিতে ঐ যাচ্ছে ভাসি
মাঠে ঘাটে হেথায় সেথায়
ছড়িয়ে হাসি রাশি রাশি
আমি, কান্নাকাটির ধার ধারি না
হাসিখুসী ভাল বাসি।"

চুম্‌কির মুখে হাসি। মনে খুসী। চোখে আনন্দ। সে বল্‌লে "গান গেয়ে আমার মনটা ভাল হ'য়ে গেছে। বৃষ্টির প্যাচপেচে কাদা যেমন রোদে শুকিয়ে যায়—গানের আনন্দে আমার মনের দুঃখ ও গেছে তেমনি শুকিয়ে—"

মুখ্ গোম্ড়া করে ছিঁচ্কাঁদুনে বল্লে, "রকম দেখলে—গা জ্বলে যায়। আহা কি যে হাসির ছ্যারি! বলি অত হাসির ঘটা কেন ? ফুঃ আমার বোন্ খুন্সুটি তুমি কখ্খনো নও! সে অমন মুখ বেকিয়ে বেকিয়ে ব্যাংয়ের মত হাসে না!"

চুমকি বল্লে, "হাসতে জানলে ত' হাসবে। কি যে নামের ছ্যারি খুন্সুটি! ওয়াক থু ঃ! খুন্সুটির মত হতে আমার বয়েই গ্যাছে। রাতদিন প্যাচার মত মুখ করে সানাইয়ের পোঁ ধরলেই বুঝি ভাল।

যেমন দাদা তার তেমনি বোন্!
যেন, শেওড়া বনের ধারে ঘেঁটুবন।"

এই না শুনে ছিঁচ্কাঁদুনে ভঁ্যা ভঁ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়—দৌড়......

চুমকি জানালা দিয়ে দেখলে—সে দৌড়তে দৌড়তে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশল।

সে হাঁফ ছেড়ে জান্লার ধারে বস্লো। তখনও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে,—রোদও উঠেছে। আকাশে বিরাট একটা রঙীন রামধনু উঠেছে...। বেড়াতে যেতে না পারার দুঃখ আর চুম্কির মনে নেই। যে আপন মনে গুন্গুন্ করে ছড়া কাটছে—

"কি সুন্দর বৃষ্টি পড়ে
আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝড়ে
রামধনুকের বাঁকটী কাঁধে
মেঘ বুড়ো যায় আলোর বাঁধে
সেখান থেকে আনবে আলো
থাকবে না আর কোথাও কালো......

সেই থেকে চুম্কিকে কেউ আর কাঁদ্তে দেখেনি।

সিংখুড়োর মামাতো ঘড়ি

সিংখুড়োর বাড়ীর বৈঠকখানায় আলমারীর তলায় একটা পেল্লায় দেওয়াল ঘড়ি শোয়ানো ছিল। একদিন ছেলের দল ছেঁকে ধরল—

ওটা ওখানে কেন, সিং খুড়ো ?

"ওটা কি ঘড়ি, সিং খুড়ো ?"

সিং খুড়ো হেসে বললেন, 'ওঃ সে এক প্রকাণ্ড গল্প। ঐ ঘড়িটার জন্যে আমি সর্বস্বান্ত হ'তে বসেছিলাম রে! এখনও আমার নামে একটা হুলিয়া ঝুলছে।'

সে কি ব্যাপার সিং খুড়ো ?

সিংখুড়ো গম্ভীর ভাবে কি যেন ভেবে উত্তর দিলেন—খুনের দায়—ঐ ঘড়িটার জন্যে একটি লোককে খুন করেছি—'

গল্প রীতিমত জমে উঠেছে। বিদ্যুৎ সিংখুড়োর গা ঘেঁষে বসে বললে—"বলুন আদ্যোপান্ত সমস্ত গল্পটা।"

উপেন তার সদ্য-পরা চশমা জোড়া একবার নাক থেকে উঠিয়ে আবার বসিয়ে বললে—'খুন করে এই ঘড়িটা পেয়েছেন বুঝি ?'

দূর বোকা—"খুন করে ঘড়ি পাব কেন ? ওটা যে আমার নিজের মামার ঘড়ি। আমার মামা ছিলেন দারুন খামখেয়ালী—বিপুল টাকার মালিক। মারা যাবার পর যখন তার এটর্ণি আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালো, আমি ত' আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলাম। আনন্দের চোটে এমন একখানা লাফ দিলাম যে অলিম্পিকে ওরকম লাফ দিলে বোধ হয় আমি

ফার্ষ্ট প্রাইজ পেতাম। কিন্তু এটর্ণি বাড়ী গিয়ে শুনলাম মামা যাবতীয় টাকাকড়ি সব তার ভাইপোকে দিয়ে গেছেন। আমাকে কেবল দিয়ে গেছেন তাঁর অত্যাশ্চর্য দেওয়াল ঘড়ি এবং অদ্ভুত শীকারী কুকুরটা।"

বিদ্যুৎ বললে—'হ্যাঁ, সে শিকারী কুকুরের গল্প আমরা শুনেছি কিন্তু—

উপেন বললে,—'আর 'কিন্তু'-তে কাজ নেই, ঘড়ির গল্প চলুক—'

সিংখুড়ো বললে, 'চেনবাঁধা কুকুরটাকে এক বগলে আর ঘড়িটাকে আরেক বগলে করে মামার বাড়ীর দিকে পিছন ফিরে শেষ পেন্নাম করে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলাম।'

বাড়ীতে এসে ঘড়িটাকে ঘরের দেওয়ালে টাঙালাম···টাঙাবা মাত্র ঘড়িটা চলতে সুরু করল। ভেতর থেকে আওয়াজ হতে লাগল টক্—টক্—টক্—টক্। সে যেন আমার মনের কথা বলছে—ঠক্—ঠক্—ঠক্—ঠক্—অর্থাৎ আমার মামা একটি আসল ঠগ। তা না হলে তাঁর অত্যাশ্চর্য ভাগ্নেটিকে এমনি করে কেউ ঠকায়!

ঘড়িটা কিন্তু নির্ভুল সময় দিতে লাগল। তখন কলকাতার অর্দ্ধেক লোক আমার ঘড়ি দেখে তাদের ঘড়ি মেলাতো—

ঘণ্টেশ্বর বললে! কি ঘড়ি ওটা—

সিংখুড়ো বললে—সে এক ভারী অদ্ভুত নাম—

KaKoKalKaxKopentoK—আমি সংক্ষেপে বলতুম KohentoK!

বিদ্যুৎ লাফিয়ে গেল আলমারীর কাছে—'দেখি ঘড়িটা টেনে বের করে—'

সিংখুড়ো অমনি হ্যাঁ হ্যাঁ করে ছুটে গিয়ে তাকে নিরস্ত করলেন—খবর্দার ! ঘড়িতে একদম হাত দিওনা—'

বিদ্যুৎ বললে 'দেখিনা কেমন ঘড়ি—'

সিংখুড়ো বললেন—"উঁহু—ও এখন যোগনিদ্রায় আছে। ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী ঐ ঘড়ি আবার বাজবে—টাইম দেবে।"

সকলে বললে—'ওঃ খারাপ হয়ে গেছে বুঝি ?'

সিংখুড়ো বললেন 'সামান্য খারাপ হ'য়েছিল। তাই ওকে রেষ্ট দেওয়া হচ্ছে—সোজা কথা নয়—পাঁচশো বছর একদমে চলেছে।'

পিতু, সীতু বিস্ময়ে চোখ বিস্তারিত করে বলে উঠল—পাঁচশো বছর।

—সিংখুড়ো সোৎসাহে বললেন। হাঁরে, হাঁ—হিসেব করে ঢ্যাখ্, না ১৪৫৪ সালে বেলজিয়ামে ওর জন্ম।

বিদ্যুৎ বললে—আপনি কি করে জানলেন ?

সিংখুড়ো বললেন 'মামা ঘড়িটা নিলাম থেকে দশ হাজার টাকায় কিনেছিলেন। ওটা এক অদ্ভুত ঘড়ি, কিন্তু ওর কল-কব্জা সব অন্য রকমের। ঘড়ির সঙ্গে ছিল একটা লম্বা ফিরিস্তি লেখা দলিল। তাতে ওর মেকানিজম্ অর্থাৎ কলকব্জা—ওর কারিগর বুঝিয়ে লিখে রেখে গিছল। ঘড়ি তৈরীর পরই সে মারা যায়।'

উপেন বললে—'সে আমরা আগেই জানি।'

সিংখুড়ো তাল ঠুকে তেড়ে এলেন—'জানিস্ ? জানিস্ ত' গল্প শুনতে আসিস্ কেন ? গল্প লিখতে পারিস্ না ?'

ঘোতা বললে, জানে—মানে ও আন্দাজ করে নিয়েছে, অদ্ভুত আশ্চর্য ঘড়িটা তৈরী করতে বেচারাকে রাতদিন কতই না

পরিশ্রম করতে হয়েছিল—তাই শেষ পর্যন্ত বোধ হয় টিকল না’

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

ঘনা বললে, ‘কারিগরের নাম কি, সিংখুড়ো ?’

সিংখুড়ো বললেন—‘জাঁ এস্‌কোরা—হ্যাঁ। এ নাম।’

বাবলু তার সদ্য কামানো গোঁফের জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—‘মস্করা করছেন না ত’ ?

চোখ পাকিয়ে সিংখুড়ো ধমক দিলেন—চোপ্‌র ’ও বেয়াদব—বড্ড লায়েক হয়েছ, না ?

পটু বললে সিংখুড়ো। ঘড়ির গল্প যে চাপা পড়ে যাচ্ছে।’

সিংখুড়ো আবার স্থরু করলেন—’কয়েকদিন ঘড়িটা বেশ চললো—কয়েক দিন কেন, কয়েক বছর। তারপর একদিন শুনি, বারোটার সময় তেরোটা বাজল—আমি কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, কিন্তু একটার সময় শুনলাম, পরিষ্কার ঢং ঢং করে তুটো বাজল।

আলোক হাসি চেপে বললে—‘সেইদিন থেকেই বুঝি ঘড়িটার বারোটা বাজল।

সিংখুড়ো শুধু তার দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে আবার স্থরু করলেন—‘ঘড়িটা পুনরায় বগলদাবায় করে কলকাতার দোকানে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু কোন দোকানেই ঘড়ি সারাবার ঝুঁকি নিতে চাইল না। অবশেষে একজন ইহুদি দোকানদার অনেক দেখে শুনে বললে যে, ঘড়িটার পেণ্ডুলাম বাদ দিয়ে নতুন পেণ্ডুলাম বসালে ঘড়িটা আবার ঠিক সময় দেবে। তাকেই দিয়ে এলাম ঘড়িটা।’

বিদ্যুৎ জিজ্ঞাসা করলে ‘কত চার্জ চাইলে ?’

সিংখুড়ো বললেন 'হ্যাঁ, বেশ মোটামুটি দু'শ খানি টাকা কিন্তু ঘড়ি নিতে গিয়ে এক বিভ্রাট্—দোকানে ঢুকতে পারিনা এত ভীড় ! অনেক কষ্টে ভীড় ঠেলে ঢুকে দেখি দেওয়ালের হুক থেকে ঝোলানো শুধু একটা পেণ্ডুলাম অদ্ভুত ভাবে দুলছে, ঠিক যেন ঘড়ির মধ্যেই দুলছে আর তাই দেখতে রাজ্যের লোক দোকানে ভিড় করেছে।'

বিদ্যুৎ বললে 'আপনার মামাতো ঘড়ির পেণ্ডুলামটা বুঝি ?'

সিংখুড়ো বললেন হ্যাঁরে কি আশ্চর্য ব্যাপার—পাঁচশো বছর দুলে দুলে ওর মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তির উদ্ভব হ'য়েছিল, তাই বিনা কলকব্জায় ও আপনি দুলছিল।'

হাসির হররা উঠলো ঘরময় ! সিংখুড়ো একটু থেমে আবার সুরু করলেন 'আমি ইহুদি লোকটাকে দেখতে পেয়ে আমার ঘড়িটা ফেরৎ চাইলাম। কিন্তু সে বললে মশাই পেণ্ডুলাম পাওয়া যাচ্ছেনা—আর ঐ পেণ্ডুলাম দিলে ঘড়ি চলছে না—এখন কি করি বলুন !'

'রাগে দুঃখে আপশোসে আমি তখন পাগলের মত হয়ে গিয়ে একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলাম। আর লোকটা দুম ক'রে পড়ে মারা গেল।'

কপট আশ্চর্য ভাব মুখে ফুটিয়ে বিদ্যুৎ বললে—

'মরে গেল ?'

উপেন বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ ঘড়ির সঙ্গে ঘড়িয়ালেরও বারোটা বেজে গেল।

'খুন দেখে লোকজন ভোঁ ভোঁ করে সরে গেল।' সিংখুড়ো আবার সুরু করলেন—আমিও, তিন লাফে টেবিলের উপর থেকেআমার ঘড়িটা বগলদাবায় করে ভোঁ দৌড়—'

উপেন বলে উঠল—'এবারেও বোধ হয় অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গে ছিলেন ?'

সিংখুড়ো বললেন 'নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে !'

ঘণ্টেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে—'কিন্তু সেই পেণ্ডুলামটা ?'

সিংখুড়ো বললেন, 'দ্যুৎতোর পেণ্ডুলাম্—সর্বনাসে সমুৎপন্নে কিনা আর পেণ্ডুলামের ভাবনা করলে চলে ?'

পুটু বললে—'সেটা তেমনি হুকে থেকে দুলতে রইল।'

বিদ্যুৎ বল্লে—আলবাৎ আজও দুলছে সেটা।

সিংখুড়ো পুনরায় স্থরু করলেন—'তারপর কিছু দিন গা-ঢাকা! গোঁফ রাখলুম, দাড়ি রাখলুম একদম সন্ন্যাসী সাজলুম এবং একদিন আবার ঘড়ি মেরামতের ফিকিরে রাস্তায় বেরুলুম—এবার আরেক দোকান 'ক্লক হসপিট্যাল'। ঘড়ি দেখেই দোকানী চমকে উঠল—'এঘড়ি কোথায় পেলেন ? এ যে অত্যন্ত দামী ঘড়ি—কলকব্জা আজ কাল পাওয়া যাবে না। বেলজিয়াম থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়ে আনতে হবে কিন্তু সময় চাই। এক মাস সময় দিলাম। একমাস বাদে গিয়ে দেখি ঘড়ি দেয়ালে ঝুলছে—পেণ্ডুলাম নেই কিন্তু কাটা ঘুরছে।'

দোকানী বললে- 'আজব ঘড়ি মশাই, যেই খুলেছি অমনি কলকব্জা, ওর হেয়ার স্প্রিং লাফাতে লাফাতে ছিট্‌কে চলে গেল। চাকা গুলো বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে ছুটলো—পড়ে আছে ঐ খোলটা কিন্তু চলছে ঠিক, দেখুন রাইট টাইম।'

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে লোকটার গালে ঠাস করে চড় কসিয়ে দিলাম এবং ঘড়িটা দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে চম্পট দিলাম।'

উপেন বললে—মরল না লোকটা ?

নিতুবললে—'অজ্ঞান হ'লনা লোকটা ?'

বিদ্যুৎ বললে 'চোখে নিশ্চয় সর্ষে ফুল দেখছিল লোকটা আর সিংখুড়ো সেই ফাঁকে পিট্‌টান দিয়েছে।'

সিংখুড়ো হেসে বললেন 'ঠিক ধরেছিস্।'

গজেন বললে—'তারপর সিংখুড়ো?'

সকলের চোখেই আগ্রহাকুল প্রশ্ন 'তারপর? তারপর?'

সিংখুড়ো ঝিমিয়ে পড়ে বললেন—তারপর আর কি? গল্প খতম।

বিদ্যুৎ বললে 'ওটা তাহ'লে ঘড়ির খোলস?'

বাবলু বললে—'তবে যে বললেন যোগনিদ্রায় আছে ঘড়িটা?

আলোক বললে 'কাটা কি এখনও ঘুরছে সিংখুড়ো?

সিংখুড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন 'না।'

পুটু বললে 'তাহ'লে ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী ওটা আর চলবে না?'

সিংখুড়ো বললেন 'চলে কি না চলে এসে দেখে যাস্ কিন্তু টিকিট করব আমি নগদ একটাকা—টিকিট প্রবেশ মূল্য, হ্যাঁ।'

—*—